শুকতারা

ষড়্‌বিংশ বর্ষ • দ্বাদশ সংখ্যা

মাঘ • ১৩৮০

রহস্যময় অভিযাত্রী

টাট টাট টাট

ট্রিগারে চাপ দিন প্রোফেসার! ওই ওরা এসে পড়েছে!

আগ্নেয়াস্ত্রের কয়েকবার অগ্নি উদ্গীরণ, তার পরেই সব শান্ত!

ওঃ, কী ভয়ানক! আমি এর আগে কখনো কাউকে গুলি করিনি!

এছাড়া কোন উপায় ছিলো না প্রোফেসার! আর অশুভ কাজের পরিণাম এই হয়। যাক, আপনাকে নিরাপদে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারছি এটাই আনন্দের কথা!

শেষ

*** এ বছরের নতুন বই ***

● শিশু শ্রেণী ●

১। এসো পড়ি আঁক শিখি
(এক বইতে তিন বিষয়)
—শ্রীশ্যামাপদ দত্ত ২·০০

২। ঝুমঝুমি—মধুসূদন দেব ১·২০

● প্রথম শ্রেণী ●

গণিত :—
নব গণিত সুধা, ১ম ভাগ
—মধুসূদন দেব ১·৫০

ভূগোল-বিজ্ঞান :—
শিশুদের পরিবেশ
—মধুসূদন দেব ১·৫০

ইতিহাস :—
ছবিতে ভারতের ইতিহাস
—দেব সাহিত্য-কুটীর ১·৫০

● দ্বিতীয় শ্রেণী ●

গণিত :—
নব গণিত-সুধা, ২য় ভাগ
—মধুসূদন দেব ২·০০

ছড়ার বই :—
সাঁঝের ছড়া—মধুসূদন দেব ১·৫০

ভূগোল-বিজ্ঞান :—
প্রশ্নোত্তরে পরিবেশ ও পরিজন
—মধুসূদন দেব ১·৫০

English :—
Picture Primer
—M. S. Dev ১·৫০

● তৃতীয় শ্রেণী ●

গণিত :—
নব গণিত-সুধা, ৩য় ভাগ
—মধুসূদন দেব ২·৫০

Eng. Gram. :—
Peacock English Grammar
(III & IV)—S. P. Dutta . ১·৫০

পরীক্ষা সংকেত :—
পরীক্ষা সাথী, ১ম ভাগ
—শ্রীশ্যামাপদ দত্ত ৩·৫০

● চতুর্থ শ্রেণী ●

পরীক্ষা সংকেত :—
পরীক্ষা সাথী, ২য় ভাগ
—শ্রীশ্যামাপদ দত্ত ৪·০০

—সোল ডিষ্ট্রিবিউটর—

পি. সি. মজুমদার অ্যাণ্ড ব্রাদার্স

কলিকাতা—৯ (P)

বাঁটুল দি গ্রেট

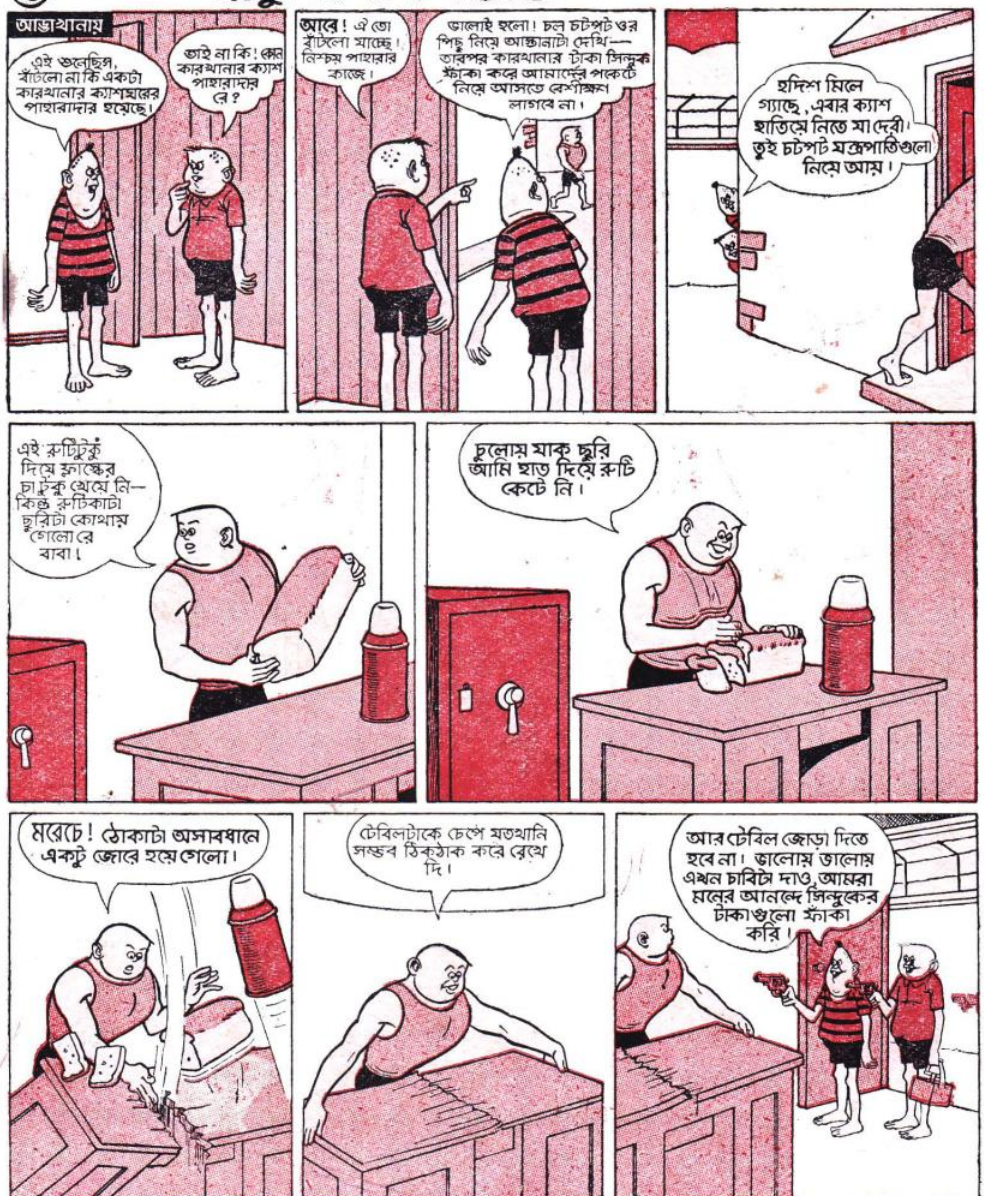
আড্ডাখানায়
এই শুনেছিস, বাঁটুলো না কি একটা কারখানার ক্যাশঘরের পাহারাদার হয়েছে!
তাই না কি! কোন কারখানার ক্যাশ পাহারাদার রে?
আরে! ঐ তো বাঁটুলো যাচ্ছে! নিশ্চয় পাহারার কাজে।
ভালোই হলো। চল চটপট ওর পিছু নিয়ে আস্তানাটা দেখি— তারপর কারখানার টাকা সিন্দুক ফাঁকা করে আমাদের পকেটে নিয়ে আসতে বেশীক্ষণ লাগবে না।
হদিশ মিলে গ্যাছে, এবার ক্যাশ হাতিয়ে নিতে মা দেরী। তুই চটপট যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে আয়।
এই রুটিটুকুঁ দিয়ে ফ্লাস্কের চাটুকু খেয়ে নি— কিন্তু রুটিকাটা ছুরিটা কোথায় গেলো রে বাবা।
চুলোয় যাক্ ছুরি আমি হাত দিয়ে রুটি কেটে নি।
মরেচে! ঠোকাটা অসাবধানে একটু জোরে হয়ে গেলো।
টেবিলটাকে চেপে মতখানি সম্ভব ঠিকঠাক করে রেখে দি।
আর টেবিল জোড়া দিতে হবে না। তালোয় তালোয় এখন চাবিটা দাও, আমরা মনের আনন্দে সিন্দুকের টাকাগুলো ফাঁকা করি।

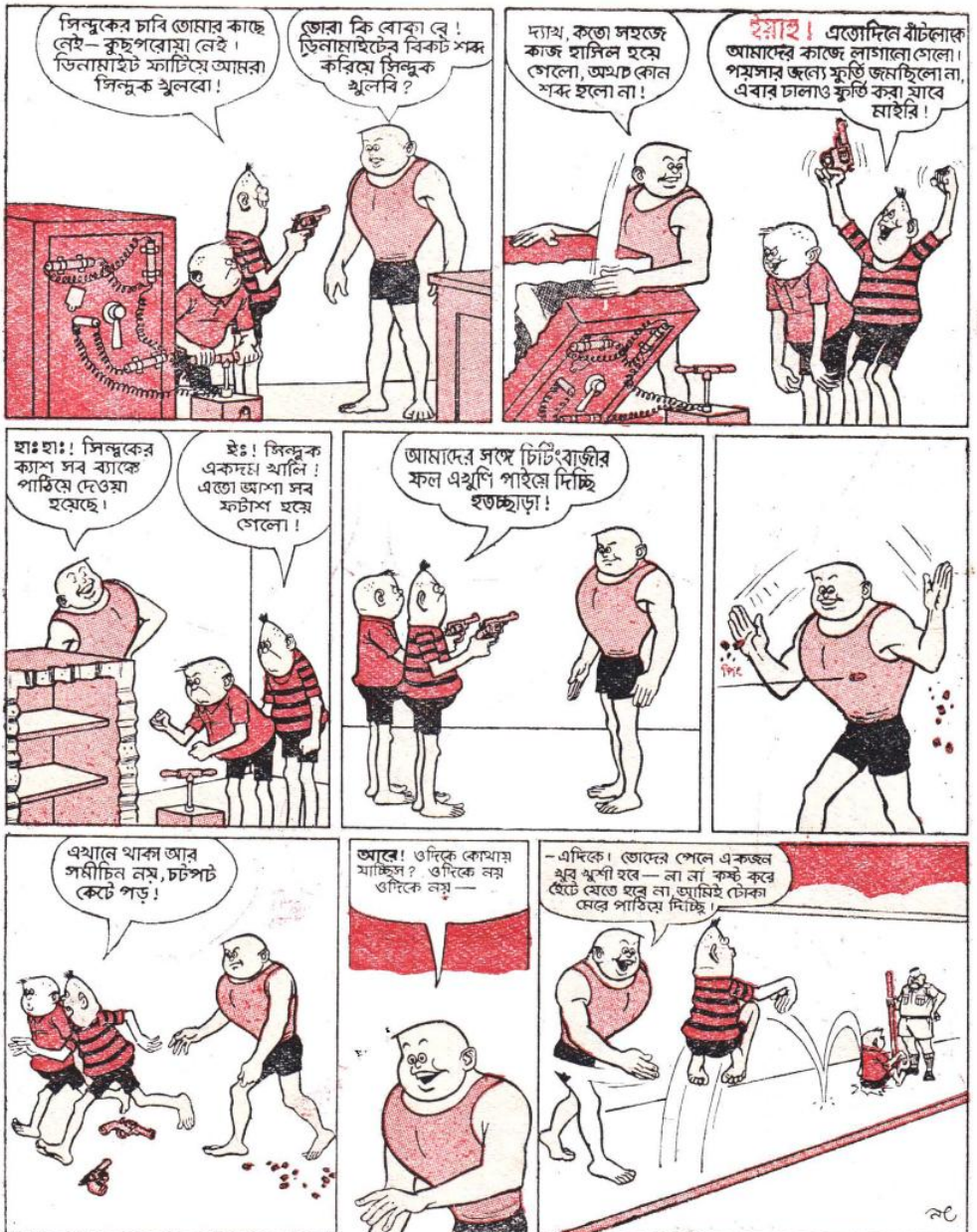
সিন্দুকের চাবি তোমার কাছে নেই— কুছপরোয়া নেই। ডিনামাইট ফাটিয়ে আমরা সিন্দুক খুলবো!
তোরা কি বোকা রে! ডিনামাইটের বিকট শব্দ করিয়ে সিন্দুক খুলবি?
দ্যাখ, কতো সহজে কাজ হাসিল হয়ে গেলো, অথচ কোন শব্দ হলো না!
ইয়াহ! এতোদিনে বাঁটলোক আমাদের কাজে লাগানো গেলো। পয়সার জন্যে ফুর্তি জমছিলো না, এবার ঢালাও ফুর্তি করা যাবে মাইরি!
হাঃহাঃ! সিন্দুকের ক্যাশ সব ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।
ইঃ! সিন্দুক একদম খালি! এতো আশা সব ফটাশ হয়ে গেলো!
আমাদের সঙ্গে চিটিংবাজীর ফল এখুণি পাইয়ে দিচ্ছি হতচ্ছাড়া!
এখানে থাকা আর সমীচিন নয়, চটপট কেটে পড়!
আরে! ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস? ওদিকে নয় ওদিকে নয়—
—এদিকে। তোদের পেলে একজন খুব খুশী হবে— না না কষ্ট করে হেঁটে যেতে হবে না, আমিই টোকা মেরে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

"শুকতারা"

Approved by the Directorate of Public Instruction. West Bengal as Children's Monthly Magazine vide No. 321 (9)-T. B. C.

(Dated 14th August, 1971, 2B-20G/71)

সূচীপত্র—মাঘ, ১৩৮০

	বিষয়	লেখক লেখিকা	পৃষ্ঠা
১	রহস্যময় অভিযাত্রী ...	নারায়ণ দেবনাথ ...	প্রচ্ছদপট
২	বুলটুল দি গ্রেট ...	নারায়ণ দেবনাথ ...	প্রথম ছবি
৩।	কিম্বদন্তি (কবিতা) ...	অমিয় কুমার মুখোপাধ্যায় ...	৮৩৭
৪।	যুগ পালটেছে ...	— ...	৮৩৮
৫	সোনার ঘণ্টা (ধারাবাহিক উপন্যাস) ...	অনিল ভৌমিক ...	৮৩৯
৬।	৯ নং প্রশ্ন ...	— ...	৮৪৬
৭	বেলুন আবিষ্কার (জানবার কথা) ...	নারায়ণ চক্রবর্তী ...	৮৪৭
৮।	মুন্নার বাজীপ্রভু দেশপাণ্ডে (অমর বীর কাহিনী)	শ্রীমধুসূদন মজুমদার ...	৮৫১
৯।	সোনা ও রূপা (ছবিতে গল্প) ...	দিলীপ দাস ...	৮৬০
১০।	ফাটকের সেই মুর্ত্তিটি (গল্প) ...	পরিমলকুমার দে ...	৮৬২
১১।	অ্যাপিনের গবেষণা (বিদেশী গল্প) ...	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা ...	৮৬৭
১২।	জাবালুঙ্গ ও টারজান (অ্যাডভেঞ্চার) ...	সব্যসাচী ...	৮৭৩
১৩।	রূপকথার আলেকজাণ্ডার (গল্প) ...	বিমলেন্দু দাশগুপ্ত ...	৮৮১
১৪।	ঈশপের গল্প (গল্প) ...	গোরাচাঁদ পাল ...	৮৮৪
১৫	পাঁচুকার দ্বারা জয়লাভ ...	পূরবী দেবী ...	৮৮৯
১৬।	হাঁদা-ভোঁদার বুদ্ধি খাটানো (ছবিতে গল্প) ...	— ...	৮৯০
১৭।	গদর পার্টি ও কোমাগাটা মারু (শহীদ স্মৃতি কথা)	রঞ্জন মিত্র ...	৮৯২
১৮	সেই ছোট্ট মেয়েটি (সত্য ঘটনা.) ...	নির্মলেন্দু গৌতম ...	৮৯৭
১৯।	মধুর বাক্য (প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা) ...	শর্মিলা রায় ...	৯০২
২০।	৮৪৬ পৃষ্ঠার ৯নং প্রশ্নের উত্তর ...	— ...	৯০৩
২১।	বানরের বাঁদরামি (দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা)	শ্রীউষারানী চৌধুরী ...	৯০৪
২২।	মানুষ বেচার ব্যবসা (সত্য ঘটনা) ...	জীবন ভৌমিক ...	৯০৫
২৩।	রাজার শাস্তি (রূপকথা) ...	মুরারী মোহন মণ্ডল ...	৯০৮
২৪।	"শৈলবালা কুমার নাগ স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"	(ঘোষণা) ...	৯০৯
২৫।	মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি) ...	— ...	৯১০

এস. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ ৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ১১নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীমধুসূদন মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য ১·২৫ পয়সা

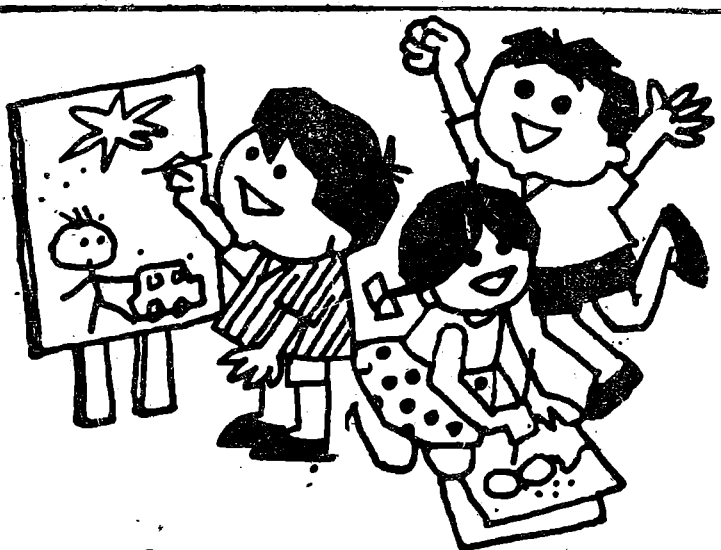

রঙের ঘটায় রঙের ছটায় জীবনে আনন্দ ডাক দিয়ে যায়

এসো এসো, সবাই এসো খেয়াল খুশির মজার খেলায় ক্যামলিনের রঙের মেলায়।
মনের মত রঙ ছড়িয়ে ফুটিয়ে তোলো, কল্পনার জল্পনা... আনন্দের আল্পনা!

ওয়াটার কালার টিউবস

ক্যামেল
আর্ট কালার্স

ক্যামলিন
প্রাইভেট লিমিটেড
জে. বি. নগর,
বোম্বাই ৪০০ ০৫৯ (ভারত)

ওয়াটার কালার কেক্‌স

পোস্টার কালার

PRATIBHA 1712-12-BEN

ষষ্ঠবিংশ বর্ষ ১২শ সংখ্যা ১৩৮০, মাঘ

কিম্বদন্তী

শ্রীঅমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়

মামার ছিল মস্ত দাড়ি
গল্পটা তো বলছি তারই।
সেই মাথেতে গোঁপের বাহার,
দু-চার কথাও হবে তাহার।
গোঁপ যা মেপে, গেছল দেখা
রাজভবনে আছে লেখা।
বাঁ-য়ে দু হাত, ডানেও তেমন
এবার বোঝ গোঁপটি কেমন।
সেই গোঁপেতে ইচ্ছে হলে
দু ধারে দুই ঘণ্টা দোলে।

মামার তাতে যায় না কিছু
সত্তেজ গোঁপও হয় না নীচু !
দাড়ির কথাও বলছি সে তো
দাস-দাসীতে আঁচড়ে দিত।
কাটেন নি তাই, কাটলে পরে
ফেল্‌তে হতো টেমপো করে।
সেবার যেটি ঘটল খেলায়
রবিবারের সন্ধ্যে বেলায়—
দু দলেতে পাল্লা চলে
লড়াই জমে বুট আর বলে।
হঠাৎ বলটি পালায় কোথা
সবাই খোঁজে হেথা-হোথা।

রেফারী-ক্যাপ্টেন-খেলোয়াড়-মালী
ভন্‌তে-নাদু খুঁজছে কালি।
তখন মামা বলেন ওরে—
নে না তোরা বলটা ধরে,
বল তো আমার দাড়ির ফাঁকে,
জড়িয়ে আছে পাকে পাকে।

যুগ পালটেছে

একটা দোকানদার একটি ক্রেতাকে বিড়াল বিক্রি করে বললে, বিড়াল ইঁদুর মারতে পারবে। দু দিন বাদে ক্রেতা চোখ গরম করে দোকানদারের কাছে এসে বললে, আপনি যা তা বলেছেন, বিড়ালটা ইঁদুর দেখে পালায়।

দোকানদার বললে, এখন যুগ পালটেছে যে।

অনিল ভৌমিক

১০

কয়েক রাত ধরে এই রকম সভা চলল। পরামর্শ হল। কীভাবে একটা জাহাজ যোগাড় করা যায়? ফ্র্যান্সিস দু'একবার বাবাকে বলবার চেষ্টা করেছে—যদি উনি রাজার কাছ থেকে একটা জাহাজ আদায় করে দেন। কিন্তু ফ্র্যান্সিসের বাবা ওকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়েছেন।

হ্যারিই প্রথমে বুদ্ধিটা দিল। হ্যারি কথা বলে কম কিন্তু যথেষ্ট বুদ্ধিমান। সে বলল, —আমরা জাহাজ চুরি করব।

—জাহাজ চুরি? সবাই অবাক্।

—হ্যাঁ, রাজা যখন চাইলে জাহাজ দেবেন না তখন চুরি ছাড়া উপায় কি?

—কিন্তু—, ফ্র্যান্সিস দ্বিধাগ্রস্ত হল।

—আমরা তো সমুদ্রে ভেসে পড়ব, রাজা আমাদের ধরতে পারলে তো! তাছাড়া —যদি সত্যিই সোনার ঘণ্টাটা আনতে পারি—তখন—

ঠিক। ফ্র্যান্সিস লাফিয়ে উঠল। সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মত হল।

গভীর রাত। বন্দরের এখানে ওখানে মশাল জ্বলছে। মশালের আলো জলে কাঁপছে। রাজার সৈন্যরা বন্দর পাহারা দিচ্ছে। অন্ধকারে মোড়া করা রয়েছে ভাইকিং রাজার জাহাজগুলো।

প্রহরীদের চোখ এড়িয়ে ফ্র্যান্সিস আর তার পঁয়ত্রিশজন বন্ধু জাহাজগুলোর দিকে এগোতে লাগল। পাথরের ঢিবি, খড়ের গাদা, স্তূপীকৃত কাঠের বাক্সের আড়ালে আড়ালে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল ওরা। হাতের কাছে সবচাইতে বড় যে জাহাজটা, সেটাতেই নিঃশব্দে উঠতে লাগল সবাই। যে সব প্রহরীরা পাহারা দিচ্ছিল তারা এতগুলো লোককে হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে জাহাজে উঠতে দেখে অবাক্ হয়ে গেল। ওরা খাপ থেকে তরোয়াল খোলবার আগেই ফ্র্যান্সিসের বন্ধুরা একে একে ওদের সবাইকে কাবু করে ফেলল। তারপর জাহাজ থেকে ছুঁড়ে জলে ফেলে দিল। জাহাজের মোড়ক খুলে দিল। জাহাজটা কূল ছেড়ে সমুদ্রের দিকে ভেসে চলল।

ওদিকে হয়েছে কি, সেই জাহাজে রাজার নৌবাহিনীর সেনাপতি একটা গোপন সভা করছিল তার কয়েকজন বিশ্বস্ত সৈন্যের সঙ্গে। আসলে সেনাপতি একটা গোপন ষড়যন্ত্র চালাচ্ছিল রাজার বিরুদ্ধে। সেনাপতিই ছিল সেই ষড়যন্ত্রের নেতা। যাতে আরো সৈন্য তার দলে এসে যোগ দেয়, গোপন সভার সেটাই ছিল উদ্দেশ্য। তারা আলোচনায় এত তন্ময় হয়ে গিয়েছিল যে, তারা জানতেও পারল না, কখন জাহাজ চুরি হয়ে গেছে, আর জাহাজ মাঝ সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ জাহাজটা দুলে দুলে উঠতে লাগল। সেনাপতি আর তার দলের লোকেরা তো অবাক্। জাহাজ মাঝ সমুদ্রে এল কী করে? ওরা সিঁড়ি বেয়ে ডেক-এ উঠে এল কী ব্যাপার দেখতে। ওরা উঠে আসছে বুঝতে পেরে ফ্র্যান্সিসের বন্ধুরা সব লুকিয়ে পড়ল। সেনাপতি তার দলবল নিয়ে ডেক-এ এসে দাঁড়াতেই সবাই লুকানো জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে ওদের ঘিরে দাঁড়াল। সেনাপতি খুব বুদ্ধিমান। বুঝল—এখন ওদের সঙ্গে লড়তে গেলে বিপদ বাড়বে বই কমবে না। কাজেই দলের লোকদের ইঙ্গিতে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে বলল।

ফ্র্যান্সিস এগিয়ে এসে বলল—সেনাপতি মশাই, আপনাকেও আমরা সঙ্গে পাব এটা ভাবতেই পারিনি। যাকগে, মিছিমিছি তরোয়াল খুলবেন না, দেখতেই পাচ্ছেন আমরা দলে ভারী। এবার আপনাদের তরোয়ালগুলো দিয়ে দিন।

সেনাপতি নিঃশব্দে নিজের তরোয়ালসুদ্ধ বেল্টটা ডেক-এর ওপর রেখে দিল। সেনাপতির দেখাদেখি তার দলের সৈন্যরাও তরোয়াল খুলে ডেক-এর ওপর রাখল। ফ্র্যান্সিসের দলের একজন তরোয়ালগুলো নিয়ে চলে গেল। সেনাপতি এবার গম্ভীরমুখে বলল—তোমরা রাজার জাহাজ চুরি করেছ—এজন্যে তোমাদের শাস্তি পেতে হবে।

—সে আমরা বুঝব। ফ্র্যান্সিস বলল।

—কিন্তু তোমরা জাহাজ নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?

—সোনার ঘণ্টা আমতে।

সেনাপতি মুখ বেঁকিয়ে হাসল।

—ওটা একটা ছেলে ভোলানো গল্প।

—দেখাই যাক না। ফ্র্যান্সিস হাসল।

ঝকঝকে পরিষ্কার আকাশ। পালগুলো ফুলে উঠছে হাওয়ার তোড়ে। শান্ত সমুদ্রের বুক চিরে জাহাজ চলতে লাগল দ্রুতগতিতে। ফ্র্যান্সিসের বন্ধুরা খুব খুশী। দাঁড় টানতে হচ্ছে না। সমুদ্রও শান্ত। খুব সুলক্ষণ। বিনা বিঘ্নেই ওরা গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাবে।

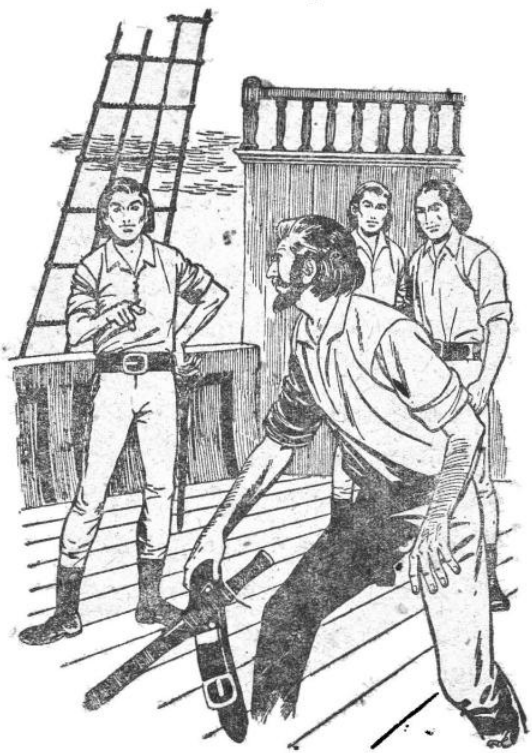

সেনাপতি নিজের তরোয়ালসুদ্ধু বেল্টটা ডেক-এর ওপর রেখে দিল। [পৃষ্ঠা ৮৪০

ফ্র্যান্সিস কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারে না। তার মনে শান্তি নেই। সারাদিন যায় জাহাজের কাজকর্ম তদারকি করতে। তারপর রাত্রে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে ফ্র্যান্সিস তখন একা একা ডেক-এর ওপর পায়চারি করে। কখনও বা রেলিং ধরে দূর অন্ধকার দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকে। একমাত্র চিন্তা—কবে এই যাত্রা শেষ হবে—সেই দ্বীপে গিয়ে পৌঁছবে।

মাঝে মাঝে হ্যারি বিছানা থেকে উঠে আসে। ওর পাশে এসে দাঁড়ায়। বলে—এবার শুয়ে পড়োগে যাও।

—হ্যারি, ফ্র্যান্সিস শান্ত স্বরে বলে—তুমি তো জান সোনার ঘণ্টা আমার সমস্ত জীবনের স্বপ্ন। যতদিন না সেটার হদিস পাচ্ছি ততদিন আমি শান্তিতে ঘুমুতে পারব না।

—তবু—শরীরটাকে তো বিশ্রাম দেবে।

—হুঁ, বিশ্রাম। ফ্র্যান্সিস হাসল—জল।

কতদিন হয়ে গেল। জাহাজ চলেছে তো চলেছেই। এর মধ্যে তিনবার ফ্র্যান্সিসদের

জাহাজ ঝড়ের মুখে পড়েছিল। প্রথম দু'বারের ঝড় ওদের তেমন ক্ষতি করতে পারেনি। কিন্তু শেষ ঝড়টা এসেছিল হঠাৎ। পাল নামাতে নামাতে দু'টো পাল ফেসে গিয়েছিল। পালের দড়িও ছিঁড়ে গিয়েছিল। সে সব মেরামত করতে হয়েছে। কিন্তু সেলাই করা পালে ভরসা করা যায় না। জোর হাওয়ার মুখে আবার ফেঁসে যেতে পারে।

জাহাজ তখন ভূমধ্যসাগরে পড়েছে। কোন বন্দরে জাহাজ থামিয়ে পাল পালটে নিতে হবে। কিন্তু ফ্র্যান্সিসের এই প্রস্তাবে সকলে সম্মত হল না। কেউ আর দেরি করতে চায় না। কতদিন হয়ে গেল দেশ বাড়ি ঘর ছেড়ে এসেছে। ফেরার জন্যে সকলেই উদ্‌গ্রীব। কিন্তু ফ্র্যান্সিস দৃঢ় প্রতিজ্ঞ—পাল পালটাতেই হবে। যে প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে তাদের পড়তে হবে সে সম্বন্ধে কারো কোন ধারণাই নেই। শুধু ফ্র্যান্সিসই জানে তার ভয়াবহতা—সেই মাথার ওপর উন্মত্ত ঝড় আর নীচে ডুবো পাহাড়ের বিশ্বাসঘাতকতা। সে-সব সামলানো সহজ ব্যাপার নয়। ফেসে যাওয়া পাল নিয়ে সেই ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করা চলবে না। শেষ পর্যন্ত রাজী হল সবাই। প্রায় সকলেরই ধারণা হল ফ্র্যান্সিস বিপদটাকে বাড়িয়ে দেখছে। এই নিয়ে ফ্র্যান্সিসের সঙ্গীদের মধ্যে গুঞ্জনও চলল।

সেনাপতি আর তার সঙ্গীরা এতদিন চুপ করে সব দেখছিল। ফ্র্যান্সিসের বিরুদ্ধে তার সঙ্গীদের ক্ষেপিয়ে দেবার সুযোগ খুঁজছিল। এবার সুযোগ পাওয়া গেল। এর মধ্যে ফ্র্যান্সিসের একটা হুকুমও সবাই ভালো মনে নিল না। ফ্র্যান্সিসেরই তিনজন সঙ্গী দেশে ফিরে যাবার জন্যে বরাবর ফ্র্যান্সিসকে বিরক্ত করছিল। কিন্তু ফ্র্যান্সিস অটল। অসম্ভব—ফিরে যাওয়া চলবে না। সে সোজা বলল—ওসব ভাবনা মন থেকে তাড়াও। কাজ শেষ না করে কেউ ফেরার কথা মুখেও এন না। কিন্তু ওরাও নাছোড়বান্দা। ওদের প্যান-প্যানানিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল ফ্র্যান্সিস। তাই যে ছোট্ট বন্দরটায় পাল পালটাবার জন্যে জাহাজটা থামল ফ্র্যান্সিস ওদের সেখানে জোর করে নামিয়ে দিল। অন্য জাহাজে করে ওরা যেন দেশে ফিরে যায়। এমনিতেই ফ্র্যান্সিসের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল। এই ঘটনাটা তাতে ইন্ধন যোগাল।

সেই ছোট্ট বন্দরটায় পাল বদলে, জাহাজের টুকিটাকি মেরামত সেরে নিয়ে আবার তাদের যাত্রা শুরু হল।

দিন যায় রাত যায়। কিন্তু কোথায় সেই দ্বীপ? কোথায় সেই সোনার ঘণ্টা? সকলেই হতাশায় ভেঙে পড়তে লাগল। এ কোথায় চলেছি আমরা? গল্পের সোনার ঘণ্টার আস্তিত্ব আছে কি? নাকি সবটাই ফ্র্যান্সিসের উদ্ভট কল্পনা? সেনাপতি আর তার দলের লোকেরা এতদিন সুযোগ পেল। তারা গোপনে সবাইকে বোঝাতে লাগল—

ফ্র্যান্সিস উন্মাদ। একটা ছেলে ভুলোমো গল্পকে ও সত্যি বলে ভেবে নিয়েছে। আর দিন নেই রাত নেই সেই কথা ভাবতে ভাবতে ও উন্মাদ হয়ে গেছে। কিন্তু ও পাগল বলে আমরা তো আর পাগল হতে পারি না? দীর্ঘদিন আমরা দেশ ছেড়েছি। কোথায় চলেছি তার ঠিকঠিকানা নেই। কবে দেশে ফিরব অথবা কেউ ফিরতে পারব কি না তাও জানি না। একটা কাল্পনিক জিনিসের জন্যে আমরা এ ভাবে আমাদের জীবন বিপন্ন করতে যাব কেন? কিন্তু উপায় কি? সবাই মুষড়ে পড়ল। সেনাপতিও ধীরে ধীরে ফ্র্যান্সিসের বন্ধুদের মন তার বিরুদ্ধে বিষিয়ে তুলতে লাগল।

এর মধ্যে আর এক বিপদ! জাহাজে খাদ্য ভাব দেখা দিল। সমুদ্রে জলে তখনও টান পড়েনি। কিন্তু কম খেয়ে আর কতদিন চলে? খাদ্য যে আছে তাতে আর কিছুদিন মাত্র চলবে। তারপর? সেনাপতি বুদ্ধি দিল সবাইকে—এখনও সময় আছে। চল আমরা ফিরে যাই। এই সবকিছুর মূল হচ্ছে ফ্র্যান্সিস। তার নেতৃত্ব অস্বীকার কর। বেশী বাড়াবাড়ি করলে ওকে জলে ফেলে দাও। তারপর জাহাজ ঘোরাও দেশের দিকে। কথাটা সকলের মনেই ধরল। শুধু হ্যারি বাদে। হ্যারি সবকিছু আঁচ করে বিপদ গুনল।

ফ্র্যান্সিস কিন্তু এতসব ব্যাপার কিছুই আঁচ করতে পারেনি। ওর তো একটাই চিন্তা যে করেই হোক সেই দ্বীপে পৌঁছতে হবে। সোনার ঘণ্টা আনতে হবে। তবে ফ্র্যান্সিস লক্ষ্য করেছে ইদানীং ওর বন্ধুরা কেমন যেন ওকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। ওর দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকায়। একমাত্র হ্যারিই আগের মত ফ্র্যান্সিসের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। তবে তার প্রশ্নেও সংশয়ের আভাস ফুটে ওঠে।

গভীর রাত্রিরে ডেক-এ দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল দুজনে। হ্যারি জিগ্যেস করল—ফ্র্যান্সিস, তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস কর সোনার ঘণ্টা বলে কিছু আছে?

—তোমার মনে সন্দেহ জাগছে? ফ্র্যান্সিস হাসে।

—সে কথা নয়। এতগুলো লোক একমাত্র তোমার ওপর ভরসা করেই যাচ্ছে।

—হ্যারি—আমি জাহাজ ছাড়ার সময়ই বলেছিলাম—যারা আমার সঙ্গে যাচ্ছে সকলের জীবনের দায়িত্ব আমার। কাউকে বিপদের মুখ থেকে বাঁচতে গিয়ে আমাকে যদি প্রাণও দিতে হয় আমি হাসিমুখে দেব।

—তোমাকে আমি ভালো করেই জানি ফ্র্যান্সিস—কথার খেলাপ তুমি করবে না। কিন্তু হাজার হোক, মানুষের মন তো—

—আমি বুঝি হ্যারি। দীর্ঘদিন আমরা দেশ ছেড়ে এসেছি—আত্মীয়স্বজন বাড়ি

ঘরের জন্যে মন খারাপ। করবে এ তো স্বাভাবিক। কিন্তু কোন বড় কাজ করতে গেলে সবরকম পিছুটানকে অস্বীকার করতে হয় নইলে আমরা এগোতেই পারব না।

—আচ্ছা ফ্র্যান্সিস, তুমি আমাদের যা যা বলেছ সে সব তোমার কল্পনা নয় তো?

ফ্র্যান্সিস কিছু বলল না। কাঁধের কাছে জামাটা এক টানে খুলে ফেলল। ও ডুরোয়ালের কোপের সেই গভীর ক্ষতটা দেখিয়ে বলল—এটা কি কল্পনা হ্যারি?

হ্যারি চুপ করে গেল। বলতে সাহস করল না যে ওর বন্ধুরা সবাই ওকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে। ফ্র্যান্সিস কথাটা শুনলে হয়তো ক্ষেপে গিয়ে আর এক কাণ্ড বাধিয়ে বসবে।

ফ্র্যান্সিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চূড়ান্ত রূপ নিল একদিন। সেদিন সকাল থেকেই সেনাপতি আর তার দলের লোকেরা গোপনে ফ্র্যান্সিসের কয়েকজন বন্ধুকে বলল—জান, আমরা পথ হারিয়েছি। ফ্র্যান্সিস নিজেই জানে না জাহাজ এখন কোন্ দিকে চলেছে, কোথায় চলেছে। এমনিতেই সকলের মনে অসন্তোষ জমা হয়ে ছিল। এই মিথ্যা রটনা যেন শুকনো বারুদের স্তূপে আগুন দিল। মুহূর্তে খবরটা সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। সেনাপতির নেতৃত্বে গোপন সভা বসল। সবাই একমত হল, সেনাপতিই হবে জাহাজের ক্যাপ্টেন। ফ্র্যান্সিসের হুকুম আর চলবে না। হ্যারিও সভার ব্যাপারটা আঁচ করে হঠাৎ সেখানে গিয়ে হাজির হল। সে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করতে উঠল। কিন্তু পারল না। তার আগেই কয়েকজন মিলে তাকে ধরে ফেলল। একটা ঘরে কয়েদী করে রেখে দিল। ফ্র্যান্সিস যতে আগে থাকতে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতে না পারে তার জন্যে সবাই সাবধান হল।

তখন গভীর রাত। ফ্র্যান্সিস একা একা ডেক-এ পায়চারি করছে। পরিষ্কার আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে চরাচর। ডেক এর ওপর সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় জ্যোৎস্নার ছড়াছড়ি। ফ্র্যান্সিসের কিন্তু কোনদিকে চোখ নেই। সে একমনে পায়চারি করছে আর মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ছে। ভুরু কুঁচকে তাকাচ্ছে জ্যোৎস্না-ধোয়া দিগন্তের দিকে।

হঠাৎ পেছনে একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনে ফ্র্যান্সিস ঘুরে দাঁড়াল। ও ভেবেছিল হ্যারি এসেছে বোধহয়। কিন্তু না। হ্যারি নয়—সেনাপতি। পেছনে তার দলের কয়েকজন। ফ্র্যান্সিসের অপ্রস্তুত হওয়ার তখনও বাকী ছিল। নীচ থেকে সিঁড়ি বেয়ে সবাই দল বেঁধে উঠে আসছে ডেক-এ। ব্যাপার কী?

সেনাপতি এগিয়ে এসে ডাকল—ফ্র্যান্সিস?

—হুঁ।

—আমরা কেন উঠে এসেছি বুঝতে পেরেছ?

—না।

—তোমাকে একটা কথা জানাতে।

—কী কথা?

—এই জাহাজে তোমার হুকুম আর চলবে না।

—আমি কাউকে হুকুম দিই না—এরা সবাই আমার বন্ধু।

—কিন্তু তোমাকে আর কেউ বিশ্বাস করে না।

—তাহলে কাকে বিশ্বাস করে?

—আমাকে। এই জাহাজের দায়িত্ব এখন আমার।

ফ্র্যান্সিসের কাছে এবার সব পরিষ্কার হয়ে গেল। এই ষড়যন্ত্রের মূল সেনাপতি আর তার সঙ্গীরা। তারাই ওর বন্ধুদের মন বিষিয়ে তুলেছে। ফ্র্যান্সিস একবার সকলের দিকে তাকাল, চিৎকার করে বলল—আমাকে বিশ্বাস কর না তোমরা?

কেউ কোন কথা বলল না। ফ্র্যান্সিস সকলের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। কেউ কেউ মুখ ফেরাল। কেউ কেউ মাথা নীচু করল। আশ্চর্য! হ্যারি কোথায়? ফ্র্যান্সিস বুঝল তাহলে ব্যাপার অনেকদূর গড়িয়েছে।

ফ্র্যান্সিস কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। গভীর দুঃখে তার বুক ভেঙে যেতে লাগল। একটা স্বপ্নকে কেন্দ্র করে এত কষ্ট এত পরিশ্রম সব ব্যর্থ হয়ে গেল। স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেল। ফ্র্যান্সিস অশ্রুরুদ্ধস্বরে বলতে লাগল, 'ভাই সব, অতি নগণ্যসংখ্যক হলেও পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষ আছে ঘরের সুখস্বাচ্ছন্দ্য যাদের ঘরে আটকে রাখতে পারে না। বাইরের পৃথিবীতে জীবনমৃত্যুর যে খেলা চলেছে—নিজের জীবন বিপন্ন করেও সেই খেলায় মাতে সে। এর মধ্যেই সে বেঁচে থাকার আনন্দ খুঁজে পায়। আমিও তেমনি একজন মানুষ।' ফ্র্যান্সিস একটু থামল। তারপর বলতে লাগল, 'তোমাদের কারো কারো মনে হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে সোনার ঘণ্টা খুঁজে বের করার পেছনে আমার উদ্দেশ্য কী? উত্তর খুবই সহজ আমি—বড়লোক হতে চাই! কিন্তু তোমরা আমার বন্ধু—ভালো করেই জানো, আমাদের পরিবার যথেষ্ট বিত্তশালী। তবে কেন আমার এত আগ্রহ? কেন এই অভিযান? ভাইসব, উদ্দেশ্য আমার একটিই। ছোটবেলা থেকে সে গল্পটা শুনে আসছি। কত রাত স্বপ্নে দেখেছি সেই সোনার ঘণ্টা। চোখ ধাঁধানো আলো ঠিকরে পড়ছে তার গা থেকে। সেই সোনার ঘণ্টা খুঁজে বের করব। তারপর দেশে নিয়ে যাব, আমাদের

রাজাকে উপহার দেব। ব্যস—আমার কাজ শেষ। এর জন্যে যে কোন দুঃখ কষ্ট বিপদ বিপর্যয় এমন কি মৃত্যুর মুখোমুখি হতেও আমি দ্বিধাবোধ করব না।'

ফ্র্যান্সিস একটু থেমে আবার বলতে লাগল—তোমারা সেনাপতিমশাইকে ক্যাপ্টেন মেনে নিয়েছ। ভালো কথা। জাহাজের মুখ ঘোরাও দেশের দিকে। ফিরে গিয়ে ঘরের সুখস্বাচ্ছন্দ্যর জীবন কাটাও গে। আমি কিন্তু ফিরে যাব না। ফেরার পথে প্রথম যে বন্দরটা পাব আমি সেখানেই নেমে যাব। জাহাজ যোগাড় করে আবার আসব। আমাকে যদি সারা জীবন ধরে সোনার ঘণ্টার জন্যে অপেক্ষা করতে হয় আমি আসব।

ফ্রান্সিস থামল। কেউ কোন কথা বলল না। হঠাৎ সেনাপতি চেঁচিয়ে বলল, এসব বাজে কথা শোনার সময় নেই আমাদের। জাহাজের মুখ ঘোরাও।

ভীড়ের মধ্যে চাঞ্চল্য জাগল। দেশে ফিরে যাবে এই আনন্দে সবাই চিৎকার করে উঠল। কিন্তু কেউই লক্ষ্য করে নি যে চাঁদের আলো ম্লান হয়ে গেছে। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের মত কুয়াশা ভেসে বেড়াচ্ছে চারদিকে। বাতাস থেমে গেছে। জাহাজের গতিও কমে এসেছে। ভীড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বলল—'এত কুয়াশা এল কোত্থেকে?' কথাটা কারো কারো কানে গেল। তারা কুয়াশা দেখে অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইল। এতক্ষণে সবাই দেখল। আশ্চর্য! এত কুয়াশা? এই অসময়ে? গুঞ্জন উঠল ওদের মধ্যে। সবাই অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইল কুয়াশার সেই আস্তরণের দিকে। (ক্রমশঃ)

প্রশ্ন ৯নং

দুটি গ্লাস ফাঁক করে দাঁড় করান আছে। তাদের মাঝে একটা কাগজ। তুমি কি ৮টি আধুলি দুটো ফাঁক করা গ্লাসের মাঝে অলতা করে বসান কাগজের উপর রাখতে পার? না পারলে ৯০৩ পৃষ্ঠায় দেখ।

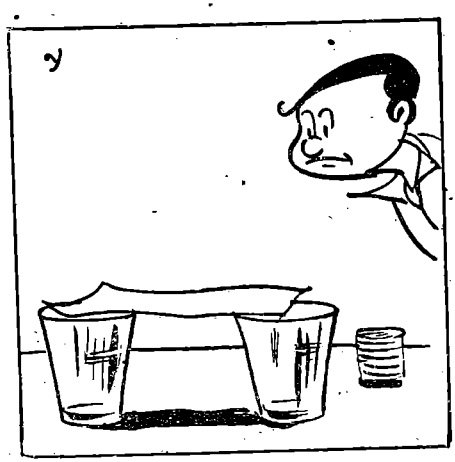

নারায়ণ চক্রবর্তী

আকাশে উড়বার সাধ মানুষের চিরকালের। এই জন্যই তো রূপকথায় পক্ষিরাজ ঘোড়ার এত ছড়াছড়ি, কাব্যে পুরাণে আছে পুষ্পক রথের কাহিনী। কিন্তু মানুষের তো আর ডানা নেই যে আকাশে উড়বে, তাই যন্ত্রের সাহায্যে আকাশে ওড়ার শখ মিটাবার দিকে নজর দিল তারা। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সফলও হল একদিন। হল বেলুন আবিষ্কার। একদিন মাটির মানুষ বেলুনে চেপে আকাশে বেড়িয়ে এল। অবশ্য সবার আগে বেলুনে চেপে আকাশে ওড়বার কৃতিত্ব মানুষের নয়। একটি ককরেল, একটি ভেড়া, আর একটি হাঁসই প্রথম গগনবিহারী হবার গৌরব অর্জন করে। ককরেল হল এক ধরনের মাছ। অর্থাৎ জলচর, স্থলচর ও খেচরদের নিয়েই প্রথম পরীক্ষাটি হয়েছিল।

১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুন তারিখে ফ্রান্সের দুই বিজ্ঞানী ও কলাকুশলী জোসেফ আর এটিয়েন মণ্ট্‌গল্‌ফারের ব্যবস্থাপনায় পৃথিবীর প্রথম বেলুনটি ধীরে ধীরে আকাশে উড়ে যায়। মাটির মানুষ তাজ্জব হয়ে তাই দেখল, হর্ষধ্বনি করে উঠল। এই বেলুনটিতে কোনো আরোহী ছিল না। এর কয়েকমাস পরে ফ্রান্সের সম্রাট ষোড়শ লুই এবং রাজদরবারের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে একটি ককরেল, একটি ভেড়া ও একটি হাঁস সহ বেলুন উড়িয়ে দেন এটিয়েন মণ্ট্‌গল্‌ফার। আট মিনিট আকাশে ওড়ার পর বেলুনটি নিরাপদে নীচে নেমে আসে। সম্রাট্ এতই মুগ্ধ হন যে তিনি বেলুনে চেপে মানুষ ওড়াবার জন্য উঠে

পড়ে লেগে যান। এজন্য তিনি একজন মৃত্যুদণ্ড পাওয়া কয়েদীকে নির্বাচিত করেন। কিন্তু এ সম্মান একজন কয়েদীকে না দেবার জন্য অনুরোধ জানালেন রাজদরবারের চিকিৎসক ফ্রান্সিস পিলাত্রে দ্য রোজিয়ার। কিন্তু নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কে আসবে এগিয়ে? এগিয়ে এলেন ঐ তরুণ চিকিৎসক। তাঁকে নিয়েই বিশাল এক বেলুন উড়ল আকাশে। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে নভেম্বর তারিখে পৃথিবীর ডানাবিহীন মানুষ সর্বপ্রথম মহাকাশে পা বাড়াল।

সারা পৃথিবীতে সাড়া পড়ে গেল। বিভিন্ন দেশে বেলুন তৈরির প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। বছর খানেক পরেই জন জেফ্‌রিস নামে একজন আমেরিকান ডাক্তার আর জাঁপিয়ের ব্লনচার্ড নামে একজন ফরাসী যুবক বেলুনে চেপে সর্বপ্রথম ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন। ওড়ার সময়ে তাঁদের হাইড্রোজেন গ্যাসে ভরতি বেলুনটাতে হঠাৎ একটা ফুটো হয়ে যায়। হু হু করে গ্যাস বেরিয়ে যাচ্ছিল, বেলুনটা ক্রমেই নীচের দিকে নেমে আসছিল। মহা বিপদ। তখন বেলুন চাপানো সমস্ত বালির বস্তা, এমন কি নিজেদের পোশাক-আশাকও ফেলে দিয়ে হালকা হয়ে কোনো রকমে আকাশে ভেসে ছিলেন তাঁরা। নীচে হাজার হাজার দর্শক রুদ্ধশ্বাসে এই দৃশ্যটি দেখছিল। নিরাপদে মাটিতে নেমে আসাতে সবাই স্বস্তি পেল মনে।

গোটা উনবিংশ শতাব্দী ধরেই আকাশে হাজার হাজার বেলুন ছাড়া হয়েছিল শুধু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালাবার উদ্দেশ্যে। সামরিক কাজেও বেলুনকে ব্যবহার করা হচ্ছিল। মধ্য ইউরোপের অস্ট্রিয়া ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বেলুনের সাহায্যে ভেনিসে বোমা ফেলতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু হঠাৎ বাতাসের গতি বদলে যাওয়াতে টাইম ফিউজ লাগানো বোমা ভরতি বেলুনগুলো অস্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনীর ওপরেই এসে পড়ে। একেই বলে যেমন কর্ম তেমনি ফল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধের সময়ে সে দেশের ইউনিয়ন আর কনফেডারেট সৈন্যবাহিনী সংবাদ আদান প্রদান করার কাজে বেলুন ব্যবহার করেছিল। ১৮৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দের ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের সময়ে প্যারী নগরকে যখন জার্মান সৈন্যরা ঘিরে ফেলে, তখন অবরুদ্ধ রাজধানী প্যারী থেকে ফ্রান্সের অন্যান্য জায়গায় চিঠিপত্র নিয়ে যাবার কাজে বেলুন ব্যবহার করা হয়েছিল। এমন কি, খুব হালে, অর্থাৎ ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে জাপানীরা বিরাট বিরাট বেলুনের সাহায্যে নয় হাজার আগুনে বোমা প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তাতে আশ্চর্য মানুষ ছিল না। চালকবিহীন এই রকম এক হাজার বেলুন

সত্যি সত্যিই উত্তর আমেরিকায় গিয়ে পৌঁছেছিল। সামরিক গোপনীয়তা রক্ষা করবার জন্য এ খবরটা ঐ সময়ে প্রচারিত হয়নি।

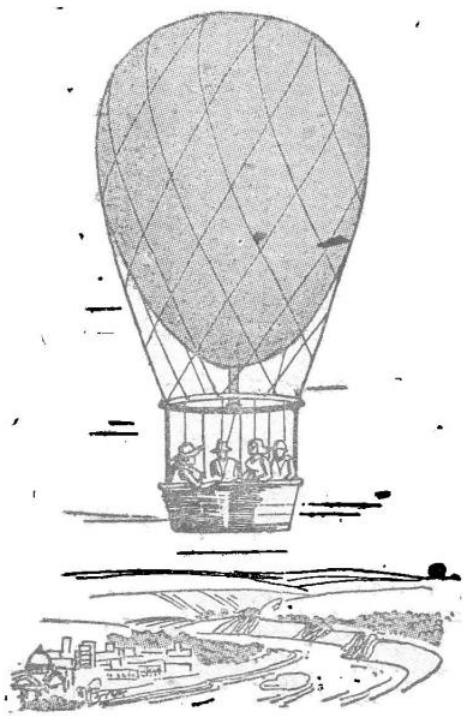

বেলুন চেপে আকাশে ওড়া কিন্তু খুব মজার ব্যাপার। [পৃষ্ঠা ৮৫০

বেলুন চেপে আকাশে ভ্রমণের জন্য ইউরোপ-আমেরিকায় অনেক বেলুন ক্লাব আছে। এই ক্লাবগুলো মাঝে মাঝে বেলুন রেসের ব্যবস্থাও করে থাকে। আগে থেকে ঠিক করে রাখা জায়গাটিতে নামতে পারলেই জিত।

বেলুনে চেপে আকাশে ওড়ার ব্যাপারটা বেশ আরামের। এতে বিশেষ কোনো কলকব্জা নেই, তাই বেলুন চালানো শেখা খুবই সহজ। আজকাল যেভাবে বেলুন তৈরি করা হয় তাতে বিপদের ঝুঁকি নেই বললেই চলে। মেলায় কেনা গ্যাসে ভরা ছোট্ট বেলুনটি যে নিয়মে আকাশে ওড়ে, মানুষ নিয়ে বড় বড় হাইড্রোজেন গ্যাসে ভরতি বেলুনও মূলতঃ সেই নিয়মেই আকাশে উড়ে যায়। অর্থাৎ গ্যাসে ভরতি বেলুনটি সম-আয়তনের বাতাসের চেয়ে হালকা বলেই বেলুনটি ওপরে উঠে যায়।

বড় বেলুনের তিনটি অংশ। সবার নীচে একটি বাস্কেট। মজবুত রাটান বেত দিয়ে তৈরী। সাইজ অনুপাতে বাস্কেটে একজন থেকে ছয়জন লোক বসতে পারে। বাসকেট থেকে একটু ওপরের দিকে একটি ৬০ থেকে ১২০ সেন্টিমিটার ব্যাসের ইস্পাত অথবা কাঠের রিং থাকে। শক্ত দড়ির জাল বুনে ঐ বাসকেটটিকে রিং থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। ঐ রিং থেকেই আবার বিশাল একটা জাল ছয় মিটার ওপরে মূল বেলুনের সঙ্গে আটকে থাকে। মূল বেলুনটিতে গ্যাস ভরা হলেই ওটা বাসকেট নিয়ে আকাশে ওড়ার জন্য প্রস্তুত হয়।

ওড়বার আগে বাসকেটে বালির বস্তা তোলা হয় ওজন বাড়াবার জন্য। তারপর মূল বেলুনটিতে খুব উঁচু প্রেসারে হিলিয়াম বা হাইড্রোজেন বা অন্য কোনো হালকা গ্যাস ভরা

হয়। বেলুনটা ফুলতে থাকে, ফুলতে ফুলতে যখন দেখা যায় যে বেলুনটা ঐ সব ভারী ভারী বালির বস্তা নিয়েই আকাশে ওড়বার উপযুক্ত হয়েছে তখন গ্যাস ঢোকানো বন্ধ করা হয়।

বেলুন থেকে গ্যাস বার করবারও ফুটো থাকে একটা। সেটা রবার স্প্রিং ভাল্‌ভ দিয়ে বন্ধ করা থাকে। এই স্প্রিং এর সঙ্গে আটকানো একটি লম্বা শক্ত সুতো বাস্‌কেট পর্যন্ত ঝুলে থাকে। ঐ সুতোয় টান দিলেই ভালভের মুখ আলগা হয়ে গ্যাস বেরিয়ে যায়, আবার সুতো ঢিল করলেই আপনা থেকে ভাল্‌ভ বন্ধ হয়ে যায়। এইভাবে গ্যাস কমিয়ে বেলুন-আরোহী বেলুনটাকে ইচ্ছে মতো নীচে নামাতে পারে। ওপরে তুলবার ইচ্ছা হলে দু একটা বালুর বস্তা ফেলে দিলেই হল। হালকা বেলুন সাঁ সাঁ করে ওপরে উঠে যাবে।

তবে নামবার সময়ে দেখে শুনে নামতে না পারলে বিপদের সম্ভাবনাও আছে বৈকি! গ্যাস-যুক্ত বেলুনটি কোনো বাড়ির ছাতে কি গাছের মাথায় বা কারখানার চিমনির ওপরে তো নামতে পারে! তা হলেই তো মহা বিপদ। দমকল ছাড়া গতি থাকে না।

সে যাই হোক, বেলুনে চেপে আকাশে ওড়া কিন্তু সত্যি সত্যিই খুব মজার ব্যাপার। গ্যাস ভরবার পরে থেকেই বেলুনটা যেন আকাশে উড়বার জন্য উথাল-পাথাল করতে থাকে। দড়ি দড়া দিয়ে বেঁধে যারা তাকে নীচে ধরে রাখতে চায় তারা নাজেহালের একশেষ হয়ে ওঠে। যাত্রীরা বাস্‌কেটে উঠে বসলে পর সমান ওজনের বালির বস্তা নামিয়ে নেওয়া হয়। বেলুনটা তখন উড়বার জন্য তৈরি। দড়িদড়া খুলে দেওয়া মাত্র বেলুনটা যাত্রীদের নিয়ে আকাশে উড়ে যায়। অভিজ্ঞ চালক তখন বালির বস্তা থেকে কিছু করে বালি ফেলে দিয়ে তার ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন। বেলুনের সঙ্গে বাঁধা বাস্‌কেটে বসা যাত্রীদের মনে তখন কী স্ফূর্তি! পাঁচশ থেকে ছয়শ মিটার ওপরে উঠলেই বেলুনগুলো বাতাসের স্রোত পেয়ে যায়, তারা তখন সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে উড়ে যেতে থাকে। হঠাৎ কোনো কারণে বেলুনটি নেমে যেতে থাকলে, চালক কয়েক মুঠো বালু ফেলে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে বেলুনটি ওপরে উঠতে থাকে। নীচে থেকে শ'য়ে শ'য়ে মানুষ হাত নেড়ে তাদের উৎসাহ দেয়, শুভেচ্ছা জানায়! মাঠ ঘাট, নদ নদী, শহর বন্দর পার হয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে উড়ে যায় বেলুনটা।

নামবার ইচ্ছা হলে সেই শক্ত সুতোয় টান দিয়ে বেলুনের গ্যাস-ভাল্‌ভের মুখ একটু একটু করে খুলতে হয়। তখন আস্তে আস্তে নীচের দিকে নামতে থাকে বেলুনটা, তারপর খোলা মাঠ দেখে মাটিতে নেমে পড়ে।

কী মজা, তাই না?

মুন্নার বাজীপ্রভু দেশপাণ্ডে

শ্রীমধুসূদন মজুমদার

"তোমার নাম বাজী, আমার নাম শিবাজী, এসো দু'জনে মিতালী করি"—বললেন তরুণ শিবাজী, ভোঁসলে শাহজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র।

যাকে সম্বোধন করে বললেন, সে হল মাহোদ গ্রামের রামপ্রভুর পুত্র, বাজীপ্রভু। বয়সে শিবাজীর চেয়ে দুই এক বছরের বড়ই বোধ হয়। তার উপরে বাড়ন্ত গড়ন বেশ, পেশল দেহ দেখলে গাঁট্টা জোয়ান বলেই মনে হয়।

রামপ্রভু! প্রভু শব্দটা একটা পারিবারিক পদবী, অনেকটা 'জমিদার' শব্দের সমার্থক। শাহজী ভোঁসলের সঙ্গে এক সাথে চাকরিতে ঢোকেন বিজাপুর সরকারে। কর্ম-কুশলতায় শাহজী ধাপে ধাপে সরকারী চাকরির তুঙ্গে উঠে যান অল্প দিনের মধ্যেই, রামপ্রভু পড়ে থাকেন নীচে, শাহজীর অনেক নীচে।

দু'জনে বলতে গেলে এক জায়গারই লোক। মাহোদে বাড়ি রামপ্রভুর, পাশের গ্রাম কেওনশালে শাহজীর। পরিচয় কেন, বন্ধুত্বই ছিল একরকম। কিন্তু সে-বন্ধুত্বে চিড় খেলো এইবার। শাহজী লজ্জিত হয়ে পড়েন, যখন সরকারী প্রথামত রামপ্রভু তাঁকে বিজাপুরী কায়দায় সেলাম বাজান, বাজাতে বাধ্য হন; নীচের কর্মচারী উপরওয়ালাকে সেলাম না করে পারবে কেন?

ওদিকে রামপ্রভুও মরমে মরে যান, এককালের বন্ধুকে দিনের মধ্যে পাঁচবার সেলাম

বাজাতে বাধ্য হয়ে। এই অস্বস্তির পরিস্থিতি থেকে অবশেষে দু'জনেই রেহাই পেলেন, যখন পিতৃব্য মারা যেতে মাহোদ গ্রামের ভূস্বামিত্ব পেয়ে গেলেন রামপ্রভু। সরকারী চাকরি ইস্তাফা দিয়ে গ্রামে চলে গেলেন তিনি। চাকরি আর জমিদারি এক সঙ্গে করা না যায়, তা নয়। শাহজীও ত করছেন! পুণায় তাঁর মস্ত জায়গির। কিন্তু রামপ্রভু আর এক দিনও বিজাপুরে থাকতে নারাজ। শাহজীর সান্নিধ্যত্যাগ করার তাগিদেই তিনি চাকরি ত্যাগ করে চলে গেলেন। রেহাই পেলেন দু'জনেই।

শাহজী ভুলে গেলেন পুরাতন বন্ধুর কথা ক্রমশঃ। ভোলা সহজ হল এই কারণে যে কেওনশালে আর তিনি যান না। স্ত্রীপুত্রকে রেখেছেন পুণার বাড়িতে, বিজাপুর থেকে যখন বাইরে যাওয়ার সুযোগ বা ইচ্ছা হয়, তখন সেই পুণাতে গিয়েই অবসর যাপন করেন কিছু দিন।

ভুলে রামপ্রভুও গিয়েছেন। ভূস্বামীর দায়িত্ব কম নয় মারাঠা দেশের গ্রামাঞ্চলে। তিনিই একাধারে গ্রামবাসীদের রক্ষক এবং শাসক। বিচার আচার, বহাল বরতরফ, পুরস্কার তিরস্কার, সবই তাঁর হাতে। ছোট গণ্ডীর ভিতর বিরাট ক্ষমতা, অসীম প্রতিপত্তি। পুত্র বাজীকে তিনি শিক্ষিত করে তুলেছেন এই পরিবেশের সঙ্গেই খাপ খাইয়ে। সে তৈরী হয়ে উঠেছে 'বন-গাঁয়ে' শেয়াল রাজার ধাঁচে। গোঁড়া, উদ্ধত, অন্যের কাছে নিজেকে 'প্রভু' বলে প্রমাণ করবার জন্য সদাসচেষ্ট। গ্রামের লোক ভয়ও করে তাকে, কারণ একে সে ভূস্বামীর পুত্র, তার গায়ে আবার বেজায় জোর তার।

হঠাৎ এই সময়ে একদিন গোটা চার পাঁচ ছেলে এল পুণা থেকে। মাওয়ালী চাষী পল্লীতে ঘোরাঘুরি করতে লাগল দুই চার দিন ধরে, "ভবানী মাঈ কী জয়" ধ্বনি তুলে উচ্চকিত করে তুলল সারা গ্রামের আকাশ বাতাস। রামপ্রভু কোন জরুরী কাজে গিয়েছেন উধালকোট শহরে, কাজীর কাছে কী-একটা এত্তেলা করবার দরকার পড়েছে তাঁর। গাঁয়ের মাতববরি কাজে কাজেই এসে পড়েছে বাইশ বছরের ছেলে বাজীর উপরে। মাতববরি জাহির করার এ-সুযোগ উপেক্ষা সে কেন করবে?

বাজীপ্রভু মাওয়ালী পল্লীতে ঢুকেই দেখল একটা বাড়ির আঙিনায় গুটি পনেরো কুড়ি ছেলে জটলা করছে। তাদের কেন্দ্রস্থলে বেঁটে, সরু-পানা, মুখে সবে দাড়ি গজাবে-গজাবে করছে, এমনি একটি তরুণ বসে আছে হাসি হাসি মুখে, মাঝে মাঝে দুই এক কথা বলছে তাদের, তারপর কান পেতে শুনছে তাদের শতেক প্রশ্ন।

বাজীকে বাড়ির সামনে দেখেই মাওয়ালী ছেলেরা যেন তটস্থ হয়ে পড়ল। তাদের কলরব হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যেতে দেখে অবাক্ হয়ে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সেই স্তব্ধতার

কারণ খুঁজতে লাগল মাকের ছেলেটি। দেখল বাড়ির বাইরে দণ্ডায়মান বাজীকে, মাওয়ালীদের জিজ্ঞাসাও করল—"কে ও ?"

"ও হল আমাদের মালিকের ছেলে, বাজীপ্রভু। ভা-রী দুঁদে ছেলে, কথায় কথায় মার-ধোর করে।"—উত্তর দিল একজন।

"মারধোর করে ? আর তোমরা মুখ বুজে সয়ে যাও ?" শাণিত প্রশ্ন আসে এইবার।

ছেলেটি অসহায় করুণ নেত্রে চেয়ে থাকে শিবাজীর দিকে। কত যে বেদনার ইতিহাস ফুটে উঠতে চাইছে সেই চাউনির ভিতর দিয়ে, তা বুঝে নেবার মত অন্তর্দৃষ্টি এই বয়সেই লাভ করেছেন শিবাজী। তা নইলে তিনি শিবাজী না হয়ে অন্য কেউ হতে পারতেন ত !

মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার পক্ষপাতদুষ্ট শ্রেণীবিন্যাসের আওতায় কত যে লাঞ্ছনা আর গ্লানি নিত্য পরিপাক করতে হয় দুঃস্থ দরিদ্র-শ্রেণীকে, তা জানেন শিবাজী। যা জানেন, তারই নতুন এক সমর্থন ঐ ছেলেটির চোখে। তিনি ওকে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে গটগট করে হেঁটে সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন, যেখানে বাজীপ্রভু বাড়ির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কটমট করে এইদিক পানেই তাকাচ্ছে। হাসিমুখে তাকে বললেম—"শুনলাম তোমার নাম বাজী। এদিকে আমার নাম হল গিয়ে শিবাজী। বাজী আর শিবাজী, এসো দু'জনে মিতালি করি।"

স্পর্ধা ! বাজীপ্রভুর দুই চোখ জ্বলে উঠল। মাহোদের জমিদার পুত্রের সঙ্গে মিতালি পাতাতে চায় এই ছোকরা ? চাষী মাওয়ালী গাঁওয়ারদের সঙ্গে-যার দহরম-মহরম ? ওকে মুখের মতন একটা কটু জবাব এক্ষুণি দেওয়া দরকার। তাতেও শায়েস্তা না হলে শেষ দাওয়াই ত আছেই ! এক প্রস্থ উত্তম মধ্যম।

উপস্থিত বুদ্ধি সেই বাজীপ্রভুর, তা কেউ বলতে পারবে না, সে চট করে বলে বসল —"মিতালি হয় সমানে সমানে। তুমি আর আমি কি সমান ? বাজী হল ঘোড়া, শিবা হল শেয়াল। ঘোড়ায় আর শেয়ালে মিতালি কোনদিন হতে পারে ?"

শিবাজী এই রকমই একটা কিছু প্রত্যাশা করছিলেন, হয় একটা কটাক্ষ, না হয় ত একটা থাপ্পড়। দুইয়ের জন্যই প্রস্তুত ছিলেন তিনি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলেন— "এ খুব ঠিক বলেছ তুমি। ঘোড়ার জন্ম পিঠে করে মানুষ বইবার জন্য, চাবুক খাওয়ার জন্য, পেটের তলায় কাঁটাওয়ালা রেকাবির খোঁচা খেয়ে রক্তাক্ত হওয়ার জন্য। আর শেয়াল, যত ছোট জীবই হোক, কোনদিন পোষ মানে না কারও, মাঝে মাঝে ক্ষেপে গিয়ে কাউকে কামড় বসায় যখন, তখন মরণ তার অনিবার্য।"

"বেতমিজ ! আমি চাবুক খাই ? কাঁটাওয়ালা—?"—যা বলবার বাসনা, তার

অর্ধেকের বেশী সে আর মুখ দিয়ে বার করতে পারল না, রাগে তার জিভ আটকে গেল গলায়। কথা অসমাপ্ত রেখে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল শিবাজীর উপরে। নিজের গায়ে জোর যে তার খুবই বেশী, তা সে জানে। এই চামচিকের মত শীর্ণ বেঁটে-পানা ছোকরাটাকে এক্ষুণি ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে লাথিয়ে লাথিয়ে পাট করে দিতে কতক্ষণ লাগবে তার ?

ঝাঁপিয়ে সে পড়ল, কিন্তু যার উপরে পড়বার তার আকাঙ্ক্ষা ছিল, সে যে কেমন করে কখন সরে গিয়েছে সেখান থেকে, সময় থাকতে সে টের পায়নি। শিবাজীর উপরে সে পড়ল না, আবার টাল সামলে নেবার সময়ও সে পেলো না। ধপাস্ করে মুখ থুবড়ে সে নিজেই পড়ে গেল মাটিতে।

ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালো ? তারই বা ফুরসুত তাকে কে দিচ্ছে ? সেও পড়েছে, তার পিঠের উপরে লাফ দিয়ে উঠেও দাঁড়িয়েছেন শিবাজী। দাঁড়িয়ে পর পর লাথি তার ঘাড়ের উপর। পাহাড়ে পাহাড়ে ছুটে-বেড়ানো শ্রীচরণ দুখানি যেন লোহার মুগুর, গোটা চারেক লাথি খাওয়ার পরই বাজীপ্রভু জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

জ্ঞান যখন হল, মাওয়ালী কুটিরের আঙ্গিনায় সে শুয়ে আছে। এবারে আর উপুড় হয়ে নয়, চিৎ হয়ে। একখানা চাটাইয়ের উপর, একটা বালিশ মাথায় দিয়ে। তার পাশে বসে সেই শিবা ওরফে শিবাজী। ক্ষিপ্ত শৃগালের মত রক্তচক্ষু তার নয়, সে চক্ষু করুণায় আর্দ্র, মমতায় মধুর। বাজী ধড়মড় করে উঠে পড়তে যাবে, চেপে ধরে তাকে শুইয়ে দিলেন শিবাজী, কোমল কণ্ঠে বললেন—"শুয়ে থাকো মিতা, একটুখানি শুয়ে থাকো। মাথাটা সুস্থ হতে দাও।"

বাজীপ্রভু শুয়েই পড়ল, পূর্ণ দৃষ্টিতে শিবাজীর দিকে তাকিয়ে বলল—"তোমার নাম শিবাজী। কিন্তু শিবাজীই বা কে ?"

"শিবাজী তোমার মিতা"—হাসিমুখে উত্তর দিলেন শিবাজী—"তুমি আমার মিতা। এই মাওয়ালী ছেলেরা, ওরা আমার ভাই। মারাঠা দেশের সব ছেলে ভাই আমার। তুমি ভাইয়ের চাইতেও বেশী, তুমি মিতা।"

সেই থেকে বাজীপ্রভু মিতা বনে গেল শিবাজীর। রামপ্রভু উধালকোট থেকে ফিরলেন যখন, অবাক্ হয়ে গেলেন এই দেখে যে ছেলে বাড়িতে নেই। এমনটা আগে কখনো হয় নি। বাজীর যদি কোন দোষ থাকে, তবে তা এই যে সে বেশ-একটু ঘরকুনো। এজন্য রামপ্রভু মাঝে মাঝে তাকে মৃদু তিরস্কারও করেছেন একটু একটু। জোর করে দুই একবার উধালকোট নিয়ে গিয়েছেন সাথে করে, কাজীর, ফৌজদারের সঙ্গে পরিচয় করিয়েও দিয়েছেন কিন্তু তিতো ওষুধের মতই সে-সব বাজীর কাছে বিতৃষ্ণার বস্তু হয়ে রয়েছে চিরদিন। রামপ্রভু

মনে মনে আশঙ্কা করতে শুরু করেছিলেন যে তাঁর অবর্তমানে এই পুত্রটি হয়ত মুসলমান মালিকদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারবে না।

বিজাপুরের আনুগত্য অস্বীকার করবার দিকে কোন ঝোঁক যে বাজীর মনে আছে, এমন সন্দেহ কোনদিন উদয় হয় নি রামপ্রভুর অন্তরে। কিন্তু ফৌজদার মনসবদার কাজীরা তোষামোদ বিলক্ষণ চান। জায়গিরদারেরা মাঝে মাঝে কলসী-ভরা গব্য ঘৃত আর পুরুষ্টু চেহারার ছাগল ভেড়া ভেট দিয়ে গেলে তাঁদের লাগে ভাল, নেক-নজরের চিহ্নস্বরূপ ভেট-দাতার অল্পবিস্তর অন্যায়কেও প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন মাঝে মাঝে। এই যেমন, জায়গিরদার যখন প্রজাদের দো-ফসলী জমিটাকে গায়ের জোরে খাসদখল করে নেন, উধালকোটে হাজার দরবার করেও সে-প্রজারা কোন সুরাহা পায় না।

"পুণার জায়গিরদার? সে ত শাহজী ভোঁসলে!" [পৃষ্ঠা ৮৫৬

এ-রকম সুযোগ-সুবিধা না পেলে জায়গিরদারিতে সুখ নেই। আর সুযোগ-সুবিধা আকাশ থেকে পড়ে না, খোসামোদ এবং ভেট, এই দুই অস্ত্রপ্রয়োগে তা অর্জন করে নিতে হয়। অথচ বাজীপ্রভু উধালকোট যেতেই নারাজ!

আশঙ্কা ছিল, কিন্তু এইবার সে-আশঙ্কা বোধহয় ঘুচবে মনে হচ্ছে। বাজী যখন গাঁয়ের বাইরে পা বাড়িয়েছে একবার, উধালকোটেও তাকে কোন না নিয়ে যাওয়া যাবে! অধীর ভাবে পুত্রের প্রত্যাবর্তনের আশায় রয়েছেন রামপ্রভু।

বলে রাখা দরকার, মাওয়ালীপাড়ায় বাজী-শিবাজী-ঘটিত ব্যাপারটার কথা কেউ কিছুই বলে নি রামপ্রভুকে। মাওয়ালীরা একদম চেপে গিয়েছে ওটা।

যা হোক, বাজী একদিন ফিরল। কিন্তু হা হতোহস্মি, এসে পিতাকে সে যা বলল, তাতে পিতার হৃৎস্পন্দন থেমে যাওয়ার মত অবস্থা হল। বাজী আর গৃহবাস করবে না।

কেন?

সে শিবাজীর দলে ভিড়েছে।

কে শিবাজী? কিসের দল তার?

দল দেশোদ্ধার ব্রতীর। মারাঠা দেশের তরুণেরা সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে বিজাপুরী ও মুঘল শাসনের পাশ থেকে দেশকে মুক্ত করবার জন্য।

আগুন হয়ে উঠলেন রামপ্রভু—"ছাই আর ভস্ম করবার জন্য। পুড়ে মরবার জন্য। ওদের শাসন যদি উচ্ছেদ করাই যেত, আমরা করতাম না? বিজয়নগর সাম্রাজ্যই পারেনি ওদের হটাতে। এসব কুমন্ত্রণা কে দিল তোমায়? কে সে শিবাজী?"

"শিবাজী পুণার জায়গিরদারের ছেলে--"

"পুণার জায়গিরদার? সে ত শাহজী ভোঁসলে! তুমি শাহজীর ছেলের দলে ভিড়েছ? লজ্জা হল না তোমার? যে-শাহজীর সংস্রব থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য আমি অমন আরামের চাকরি ছেড়ে এলাম বিজপুর থেকে---"

কোন কথাতেই কান দিল না বাজীপ্রভু। "আপনার জায়গির আমার ভাইদের দিয়ে দেবেন—" এই কথা বলে সে পিতৃসকাশে বিদায় নিল। চিরদিনের জন্য।

শিবাজীর সংগঠন দিনে দিনে শক্তি সঞ্চয় করছে। যেখানে যত মাওয়ালী জওয়ান ছিল, তারা ত এসেছেই, অভিজাত মারাঠী যারা চন্দ্র সূর্য বংশের সন্তান বলে গর্ব করে, তাদেরও সন্তানেরা এসে ভিড় করেছে মুক্তিসেনার শিবিরে। হাজার কণ্ঠে রব উঠেছে—"জয় মা ভবানী। হর হর মহাদেও!"

সেই হাজার কণ্ঠের মধ্যে যার বলিষ্ঠ কণ্ঠ সব চেয়ে সোচ্চার, সে হল বাজীপ্রভু।

আশ্চর্য পরিবর্তন হয়েছে লোকটার। কোথায় গেল সে ঔদ্ধত্য, সে ধরাকে সরা জ্ঞান করার মনোবৃত্তি, সে দৈহিক বলের দম্ভ? একটা আঘাতে তার বাইরের পরুষ আবরণ চূর্ণ হয়ে গিয়েছে, আত্মপ্রকাশ করেছে কোমল অন্তরাত্মা, দেশের মানুষের ব্যথা বেদনা যে দরদ-ভরা করুণার স্পর্শ দিয়ে মুছে নেবার জন্য সতত ব্যগ্র।

সব কাজেই মিতাকে এগিয়ে দেন শিবাজী। তানোজী মালশ্রী, মেতাজী মাধোল-করেরও পুরোভাগে তার স্থান। দুর্গের পরে দুর্গ জয় করে চলেছেন মারাঠার নবনায়ক, সিংহগড়, রায়গড়, চান্দেরী, পুরন্দর—

সব দুর্গের সেরা দুর্গ পুরন্দর! বাজীপ্রভুর উপরে ছিল এ-দুর্গ অধিকার করার ভার।

শিবাজী ছিলেন এক পাশে দাঁড়িয়ে একদল মাওয়ালী সেনা সঙ্গে নিয়ে। সংরক্ষিত বাহিনী হিসাবে। আপৎ-কালীন সাহায্যের জন্য।

সে-সাহায্যের দরকার হল না। সংরক্ষিত বাহিনীকে ডাকবারই দরকার হল না। সুপ্তোত্থিত মুঘল সেনা তরোয়াল কোমরে বাঁধবার আগেই বল্লমে বিদ্ধ হয়ে মারা পড়ল। পুরন্দরের দুর্গাধ্যক্ষ পদে বাজীপ্রভুকেই নিযুক্ত করলেন শিবাজী।

পিছন থেকে পড়ল তরোয়ালের কোপ।　[পৃষ্ঠা ৮৫৮

দিন যায়, দিল্লী দরবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। বাদশাহ ঔরঙ্গজেব শিবাজীকে আখ্যা দিয়েছিলেন পার্বত্য মূষিক। আজ কিন্তু সেই মূষিকের দন্তাঘাতে পরিত্রাহি ডাক ছাড়তে হল তাঁকে। বিজাপুরের যত দুর্গ ছিল কঙ্কন প্রদেশে, তা ত শিবাজী দখল করে নিয়েছেনই, এখন তাঁর লুব্ধ দৃষ্টি পড়েছে মুঘল এলাকার উপরে। দৃষ্টান্ত ঐ পুরন্দর। আর, শুধু দুর্গ জয় করেও ত তিনি তুষ্ট নন, সুরাটের মত সমৃদ্ধ বন্দরও তিনি লুঠ করেছেন। এ-ধৃষ্টতা দিল্লীশ্বর সহ্য করতে পারেন না।

বাদশাহ নিজের মাতুল শায়েস্তা খাঁকে পাঠিয়ে দিলেন মহারাষ্ট্রে, এই পার্বত্য মূষিককে খাঁচায় পুরবার জন্য। শায়েস্তা খাঁ পুণার দিকে এগিয়ে আসছেন শুনেই শিবাজী সদলে সপরিবারে পুণা ত্যাগ করে চলে গেলেন পুরন্দরে। শায়েস্তা খাঁ বিজয়গর্বে প্রবেশ করলেন পুণায়, দিল্লীতে এত্তেলা পাঠালেন—"দুশমনের রাজধানী যখন জয় করেছি তখন কাজ আদ্ধেক হাঁসিল হয়ে গিয়েছে। বাদশাহ নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, তাকে খাঁচায়

পুরে দিল্লী পাঠাতে বেশী দিন লাগবে না আমার।" কিন্তু হায়, এ যে তাঁর বৃথা দম্ভ, তা প্রমাণ হতেও বেশী দিন লাগল না। এক দুর্যোগের রাতে পঁচিশটি মাত্র সহচর সঙ্গে নিয়ে পুনায় হানা দিলেন শিবাজী। তাঁর নিজের ঘর এ। পথঘাট সব জানা। ছদ্মবেশে এক বরযাত্রীর দলের সঙ্গে মিশে নগরে প্রবেশ করেছিলেন, তারপর লুকিয়ে পড়েছিলেন অন্ধকার গলি ঘুঁজিতে। নিশুতি রাতে, মুষলধার বৃষ্টি মাথায় করে তিনি ঢুকে পড়লেন নিজের বাড়িতে, যে-বাড়ি এখন শায়েস্তা খাঁর বিলাস মন্দিরে পরিণত হয়েছে।

মাত্র যে পঁচিশটি মারাঠা হানা দিয়েছে রাজপ্রতিনিধির গৃহে, এ কথা শায়েস্তা খাঁ কেমন করে জানবেন? তিনি ভাবলেন—অন্ততঃ দশ হাজার মারাঠার একটা সৈন্যদল এসে চড়াও হয়েছে তাঁর উপরে। তাঁর সৈন্য ত দুর্গে! দুর্গে না গিয়ে মারাঠারা সুবেদারের ঘরে কেন? এরা ভদ্রসমাজের রীতি মানে না, দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ কয়েকজন মারাঠা তাঁর ঘরে ঢুকে পড়তেই শায়েস্তা খাঁ জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়লেন বাইরে। পিছন থেকে পড়ল তরোয়ালের কোপ, শায়েস্তা খাঁর হাত তখনও জানালার উপরে ছিল, সেই হাতের বুড়ো আঙুল কেটে নেমে গেল সেই আঘাতে। বিনা যুদ্ধে পুণা আবার অধিকার করলেন শিবাজী। শায়েস্তা খাঁ পত্রপাঠ চলে গেলেন দিল্লী। বাদশাহকে বললেন—"ভাগ্যে, আমার কর্ম নয় ইঁদুর ধরা। দেখ, আমার একটা বুড়ো আঙুল কেটে নিয়ে গিয়েছে ইঁদুরে।"

এবার বাদশাহ পাঠালেন অম্বরের রাজা জয়সিংহকে। তাঁর সঙ্গে সহকারীস্বরূপ এলেন দুর্ধর্ষ সেনাপতি দিলীর খাঁ।

জয়সিংহ প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি মিষ্টকথায় বোঝালেন শিবাজীকে। "সন্ধি করুন, সমগ্র মারাঠা দেশ আপনি পাবেন। বিজাপুরটাও যদি আপনি দখল করে নিতে পারেন, বাদশাহ তাতে আপত্তি করবেন না। উপরন্তু সুরাটের বন্দরটাও আপনাকে দিয়ে দেওয়া হবে। যে স্বাধীনতার জন্য বাদশাহের সঙ্গে শত্রুতা করছেন, মিত্রভাবেই যদি তা পেয়ে যান, তবে কেন সন্ধি করবেন না?"

হিন্দুরাজা জয়সিংহের বাক্‌জালে মুগ্ধ হয়ে সন্ধিই করলেন শিবাজী। এইবার জয়সিংহ বাদশাহের পক্ষ থেকে তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন দিল্লী যাওয়ার জন্য। শিবাজীরও একান্ত ইচ্ছা—নিজে গিয়ে একবার দেখে আসেন মুঘলের শক্তির পরিধি কতখানি এবং তার উৎস কোথায়। তবু তিনি জয়সিংহকে জিজ্ঞাসা করলেন—"দিল্লী যেতে ত বলছেন, কিন্তু হাতে পেয়ে বাদশাহ যে আমার সঙ্গে অসৎ ব্যবহার করবেন না, তার নিশ্চয়তা কী?"

জয়সিংহ নারায়ণশিলা স্পর্শ করে বললেন—"আমি নিজেকে জামিন রাখছি আপনার কাছে। আমি বেঁচে থাকতে বাদশাহ আপনার কেশাগ্র স্পর্শ করতে সাহসী হবেন না।"

শিবাজী অবিশ্বাস করতে পারলেন না বৃদ্ধ অম্বরপতিকে। তিনি দিল্লী যাত্রা করলেন, এবং পৌঁছোনো মাত্রই গৃহবন্দী হলেন বাদশাহের আজ্ঞায়।

এদিকে জয়সিংহকে ডিঙ্গিয়ে দিলীর খাঁর কাছে এল সম্রাটের আজ্ঞা—"শিবাজীকে আমি আটকে ফেলেছি। এইবারে তুমি ওর দুর্গগুলো অধিকার করে নাও।"

দিলীর খাঁ সৈন্য চালনা করলেন পুরন্দরের দিকে। যেখানে দুর্গাধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন বাজীপ্রভু।

"আত্মসমর্পণ কর"—বাজীপ্রভুর কাছে বার্তা এল দিলীর খাঁর—"বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করলে নিরাপদে বেরিয়ে যেতে পারবে। ক্ষমা পাবে বাদশাহের কাছে, চাও যদি চাকরিও পাবে বাদশাহী ফৌজে।"

"আমরা এখানে আছি দুর্গরক্ষার জন্য, আত্মসমর্পণের জন্য নয়"—উত্তর পাঠালেন বাজীপ্রভু।

আবার দিলীর খাঁর দূত এল—"শিবাজী ত দিল্লীতে বন্দী। তার আর ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই। তোমরা কার জন্য তবে মরতে চাইছ?"

"দেশের জন্য"—উত্তর দিলেন বাজীপ্রভু।

অগত্যা যুদ্ধই করতে হল দিলীর খাঁকে। একদিকে দুই হাজার মুঘল, অন্যদিকে তিনশো মাওয়ালী। তবু সেই তিনশো মাওয়ালীকে নিয়ে বাজীপ্রভু সেদিন যে যুদ্ধ করেছিলেন, তার বিবরণ মারাঠা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

বাজীপ্রভু নিজে এবং তাঁর তিনশো মাওয়ালী দুর্গরক্ষায় জীবন দিলেন সেদিন।

দিলীর খাঁর কথা মিথ্যা হল। শিবাজী ফিরে এসেছিলেন, হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারও করেছিলেন, পুরন্দর দুর্গসমেত। কিন্তু বাজীপ্রভু? তাঁকে ত আর ফিরিয়ে আনার উপায় ছিল না! অভিষেকের শুভমুহূর্তেও ছত্রপতি চোখের জল ফেলেছিলেন মিত্র বাজীপ্রভুকে স্মরণ করে।

কে তুমি ?
আমিই আনন্দ।

বিশ্বাস কর, আমি সত্যই এক-জন রাজপুত্র। এই বেঁটে বুড়োটা আমাকে জাদু দিয়ে ভাল্লুক করে রেখে ছিল।

তুমিই ওর শেষ দাড়িটুকু কেটে দিয়ে সেই জাদুর অবসান করেছ এবং আমি আবার মানুষের রূপ ফিরে পেয়েছি।

আমার দাড়ি ! আমার দাড়ি ! দাড়ি ছাড়া আমি কাজ করব কি করে ! আমি আর কাউকে জাদু করতে পারব না !

এখন তোমার সমস্ত সোনা আমাদের হলো, বুঝেছ।
আঁ!
হ্যাঁ, তুমি তাই বলেছ। ওরা শেঁগলের হাত থেকে তোমাকে বাঁচালে সব সোনা ওদের দিয়ে দেবে।
৩ঃ আমার কি দুর্ভাগ্য! আমি জাহাদাড়ি ও আমার সমস্ত ধনসম্পত্তি হুই-ই হারালাম!
করুণ, তুমি একটা মহা শয়তান। যদি তুমি আমাকে ডাল্লুক না করতে তবে তোমার আজ এই দশা ঘটতো না।

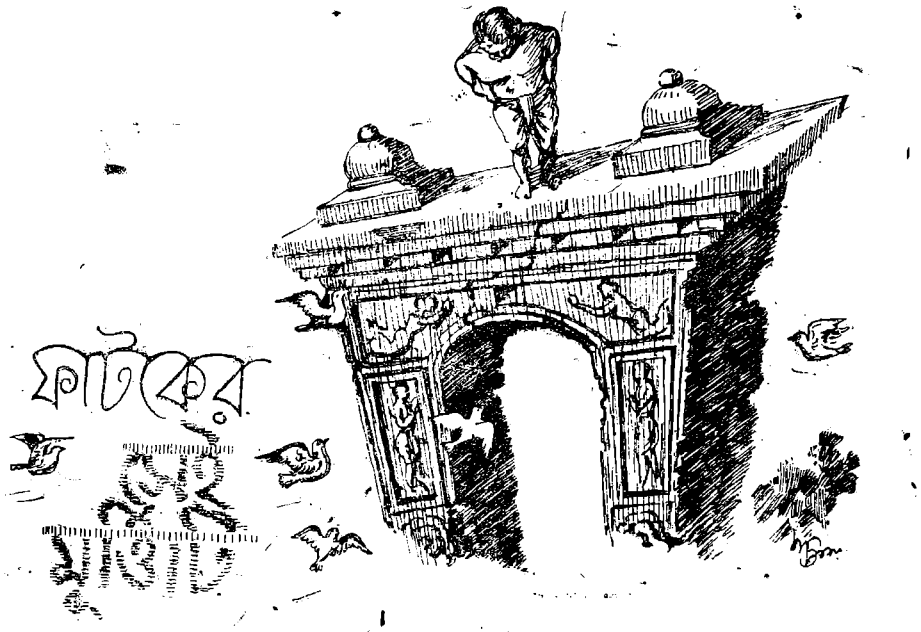

ফাটকের সেই মুখটা

পরিমলকুমার দে

নয়া টাউনের শেষ প্রান্তে পুরোনো সেই ফাটকটা আজও রয়েছে। পাথরের তৈরী। দু'পাশে দুটি স্তম্ভ। সেই স্তম্ভ দুটি যেন অর্ধচন্দ্রাকারে এগিয়ে গিয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

এই অঞ্চলের জমিদারদের পূর্বপুরুষেরা এটি তৈরি করিয়েছিলেন। বোধহয় কোন বিজয় গৌরবের প্রতীক হিসেবে!

ফাটকটার বৈশিষ্ট্য হলো, তলা থেকে ওপর পর্যন্ত দুই পাশেই খোদাই করা বিভিন্ন মূর্তি! দু'পাশের স্তম্ভ দুটোর ঠিক মাঝখানে দুটি নর্তকী হাতজোড় করে অভ্যর্থনার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। তার ওপরে নীচে আরো অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর মূর্তি!. একটি ব্যতিক্রম অবশ্য আছে।

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ওপরের দিকে একটি কোণে একটা অদ্ভুত মূর্তি রয়েছে। অসুন্দর অসুর। তার মুখে বিষাদের ছায়া। আর সে যেন মাথা নীচু করে রয়েছে। শিল্পীরা কেন ঐ মূর্তিটা তৈরি করেছিলেন এ কথা কেউ বলতে পারে না!

খোদাই করা মূর্তিগুলোর খাঁজে খাঁজে সুবিধেমতো জায়গা সংগ্রহ করে চড়াই ও আরও পাখীরা বাসা বেঁধেছে। কয়েকটা জায়গায় কিছু পায়রাও রয়েছে।

সত্যি কথা বলতে কি ঐ ফাটক এখন অবহেলিত অবস্থায় রয়েছে। কৌতূহলী দু'চারজন মানুষ মাঝে মাঝে ওটা দেখতে আসে। ওটা পাখীদের একটা আবাসস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে বললে সত্যের অপলাপ করা হবে না।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় একটা ছোট সুন্দর পাখী উড়তে উড়তে পথ হারিয়ে ঐ ফাটকের কাছে এসে পড়ল। উড়তে উড়তে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। রাত্রি হতেও বাকী নেই। ফাটকটা দেখতে পেয়ে সে ঠিক করল আজকের রাতটা ওটার ওপরই বিশ্রাম করবে।

ওড়ার গতি কমিয়ে সে ফাটকের কাছে নেমে এল। পরীক্ষা করে দেখতে লাগল কোথায় শোয়া যায়। কিন্তু যেখানেই বসতে যাচ্ছে অমনি সেখান থেকে পাখী এসে তাকে তাড়া করতে লাগল। পায়রাগুলোই বেশী বাধা দিতে লাগল। বিভিন্ন পাখীর তাড়া খেয়ে সুন্দর পাখীটা সারা ফাটকটার চারধারে উড়তে লাগল। হঠাৎ সে ওপরের দিকে ঐ অদ্ভুত মূর্তিটাকে দেখতে পেল। সেখানে কোন পাখী নেই। সুযোগ বুঝে সেই মূর্তিটার কাঁধের ওপর খানিকটা জায়গা পেয়ে সেইখানেই বসল! আশ্চর্য! অন্য কোন পাখী এসে তাড়া করল না! বোঝা গেল এইখানে অন্য পাখী বসে না। কিন্তু কেন? ছোট পাখী অবাক্ হয়ে সেই অদ্ভুত অসুর মূর্তিটার দিকে চেয়ে থাকে। অনুমান করল, অন্য পাখীরা নিশ্চয় এই মূর্তিটাকে ভয় পায়—তাই এর কাছাকাছি কেউ থাকে না। ভালোই হল। তাইতো আজ এই অসময়ে আশ্রয় পাওয়া গেল!

পরের দিন খুব ভোরে চোখ মেলে ছোট পাখী সেই অদ্ভুত মূর্তিটাকে আরও ভাল করে পরীক্ষা করতে শুরু করল। যতই তার দিকে চোখ মেলে ততই কেমন যেন করুণা হয়। অন্য মূর্তিগুলি যেন ঐ মূর্তিটাকে দল ছাড়া করে রেখেছে। হঠাৎ ছোট পাখীটার মনে হল গতকাল সন্ধ্যেবেলায় এখানকার সব পাখীগুলোই তার সঙ্গে শত্রুতা করেছে। শুধু ঐ মূর্তিটি তাকে আশ্রয় দিয়েছে। কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য ছোট পাখী হঠাৎ মধুর সুরে শিস্ দিয়ে উঠল। অমন সুন্দর কণ্ঠস্বরে অন্যান্য সব পাখীগুলো ছোট পাখীটার দিকে তাকাল।

রোদ ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে ছোট পাখী পাখা মেলে ওখান থেকে উড়ে অন্যত্র যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিটার দুঃখভরা মুখের চেহারাটা মনে পড়তে লাগল। বেশী দূর এগোন হল না। গতি পরিবর্তন করে আবার সে ফিরে গেল মূর্তিটার কাঁধের ওপর! এইবার সে অনুভব করল, তারা দুজনেই যেন একা। সবার কাছ থেকে যেন কত দূরে তারা রয়েছে। তার চেয়ে বরং এখানেই থাকা যাক। তারা দুজনে দুজনকে সঙ্গ দেবে।

ছোট পাখী ওখানেই রয়ে গেল। এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে সে খাবার সংগ্রহ করত। নিজে খেত সেই সঙ্গে সেই মূর্তিটাকে খাওয়ানোর চেষ্টা করত। ছোট পাখী তার ছোট ঠোঁটের সাহায্যে খাবারের টুকরোগুলো অসুরের মুখে দিয়ে দিত। পাথরের মূর্তির মুখ থেকে খাবারের টুকরোগুলো নীচে পড়ে যেত। ছোট পাখী মাঝে মাঝে ভাবত, মূর্তিটি বোধহয় অভিমান করে খাচ্ছে না। কিন্তু খাওয়ানোর চেষ্টা থেকে সে কখনও বিরত হল না।

এমনি করেই বেশ কিছুদিন কেটে গেল।

একদিন হঠাৎ ছোট পাখী অদ্ভুত একটা ব্যাপার লক্ষ্য করল। অসুরের মূর্তিটার মুখে দুঃখের ভাবটা যেন অনেক কমে গেছে। তার বদলে যেন মনে হল—সে হাসবার চেষ্টা করছে। ছোট পাখী মনে মনে ভাবল তার বন্ধুত্বের জয় হয়েছে। পাথরের মূর্তিটি তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে। আর তারা কেউই একা নয়! দুজনেই দুজনের বন্ধু।

যখনই সুযোগ পেত ছোট পাখী ঐ মূর্তিটার কাঁধে বসে তাকে নানা ধরনের গান শোনাত। তার জীবনের নানা অভিজ্ঞতার গল্প শোনাত! অসুরের মুখের ভাব দেখে তার মনে হোতো সে যেন তন্ময় হয়ে শুনছে! ছোট পাখীর কণ্ঠস্বর এত সুন্দর ছিল যে অন্যান্য পাখীরা অবাক্ হয়ে ছোট পাখীর দিকে চেয়ে থাকতো!

ঐ ফাটকের কাছাকাছি একটা ছাত্রাবাস ছিল। অনেক ছাত্র ঐ বাড়িতে থাকত! সেই ছেলেদের মধ্যে ছোট কয়েকজন পাখীর সুন্দর গান শুনতে পেল। তারা কৌতূহলী হয়ে ঐ ফাটকের কাছে এসে দেখবার চেষ্টা করল—কোন্ পাখীটার অমন সুন্দর গলা! প্রথম প্রথম তারা বুঝতে পারত না। কারণ ছাত্রদের আসতে দেখেই ছোট পাখী তার শিস দেওয়া, গান গাওয়া বন্ধ করে দিত। কিন্তু ছাত্ররাও দমবার পাত্র নয়। একদিন লুকিয়ে লুকিয়ে তারা আবিষ্কার করল কে অমন সুন্দর গান করে! ব্যাপারটা বোঝবার পরই তারা বুদ্ধি বের করবার চেষ্টা করল—কি করে ঐ সুন্দর পাখীটা ধরা যায়। ঐ পাখীটাকে পুষতেই হবে।

ছেলেদের বুদ্ধির জয় হল।

এক অন্ধকার রাত্রে, ফাটকের উলটো দিকে একটা বড় মইয়ের সাহায্যে উঠে, সুকৌশলে ঘুমন্ত ছোট পাখীটাকে তারা ধরে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে টর্চ জ্বেলে তারা পরীক্ষা করে নিশ্চিন্ত হল। ছোট পাখী ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কেঁদে ফেলল। তার করুণ আর্তনাদে অন্যান্য পাখীরাও জেগে গেল! টর্চের আলোয় শেষবারের মতো সে

একবার তার বন্ধুর দিকে দৃষ্টি ফেলল। ছোট পাখীর মনে হল তার বন্ধু যেন বুঝতে পেরেছে। সে যেন কাঁদতে গিয়েও কাঁদতে পারছে না। স্তম্ভিত হতবাক্ হয়ে তার দিকে চাইবার চেষ্টা করছে।

ছোট পাখীকে ধরে নিয়ে এসে তাকে একটা খাঁচায় বন্দী করা হল। তারপর সেই খাঁচা দোতলার বারান্দায় ঝুলিয়ে রাখল। বন্দী ছোট পাখী অসহায় হয়ে সেই ফাটকের দিকে দৃষ্টি ফেলবার চেষ্টা করত। নিজে কোথায় আছে সেটা বোঝাবার জন্য উচ্চস্বরে শিস দিত। মাঝে মাঝে গানও গাইত। কিন্তু খাঁচায় বাঁধা পাখীর কণ্ঠে শিস আর গান শুনে ছেলের দল ভাবত ছোট পাখী পোষ মেনেছে।

ছেলেরা ভাবত ছোট পাখী পোষ মেনেছে।

ফাটকের অন্যান্য পাখীরা এই ঘটনায় এক দিক দিয়ে খুবই খুশী হল। ছোট পাখীর সুন্দর চেহারা আর সুন্দর কণ্ঠস্বরকে তারা হিংসে করতো। ছাত্ররা এসে তাকে ধরে নিয়ে যাওয়ায় ঝামেলা চুকল।

ছোট পাখী চলে যাবার পর পায়রা, চড়াই ও অন্যান্য পাখীরা ওপরের দিকে চেয়ে মাঝে মাঝে ঐ অসুরের মূর্তিটাকে লক্ষ্য করত। হঠাৎ একদিন তাদের মনে হল

মূর্তিটার চোখের কোণে এক ফোঁটা জল! সে যেন তাদের অনুরোধ করছে—তোমরা পাখা মেলে একটু উড়ে গিয়ে দেখে এসে বলো আমার বন্ধু কেমন আছে! তোমরা আমার বন্ধুর ওপর নজর রেখো, কেউ যেন তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার না করে। মুক্তি পেলে সে যেন আমার কাছেই ফিরে আসে।

ফাটক থেকে ছোট পাখীর বুকফাটা কান্না স্পষ্ট শোনা যায়। সকালে বিকেলে সন্ধ্যেয় রাত্রে সেই করুণ সুরের মূর্ছনা চারি দিকে ভেসে বেড়ায়।

একদিন ফাটকের পাখীরা বিস্ময়ভরা চোখে দেখলো সেই অদ্ভুত মূর্তিটা যেন ফাটক থেকে ফেটে বেশ খানিকটা বাইরের দিকে বেরিয়ে এসেছে। মনে হতে লাগল অসুরটা যেন ঘাড়টা সেই ছাত্রাবাসের দিকে ফিরিয়েছে। তার মুখে আর কোন হাসির চিহ্ন নেই। পুরোনো দুঃখের ভাবটাই ফিরে এসেছে!

ধীরে ধীরে শীতকাল এগিয়ে এল! প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ফাটকের পাখীগুলো বেরুতে পারত না!

এদিকে ছোটো পাখীর কণ্ঠস্বরও আর বেশী শোনা যেত না। তারপর একদিন একেবারেই শোনা গেল না।

সেদিনটা ঠাণ্ডা এত বেশী ছিল যে খাবারের সন্ধানে কোন পাখী উড়ে যেতে সাহস পাচ্ছিল না। হঠাৎ একটা বুড়ো পাখী তার ছেলেকে বলল ছাখ না বাবা একটু উড়ে গিয়ে—ঐ হোস্টেলের কাছে ডাস্টবিনে কিছু খাবার পড়ে আছে নাকি?

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। অনেক সময় ছাত্রাবাসের চাকরটা উচ্ছিষ্ট অনেক কিছু ঐ ডাস্টবিনে ফেলে!

একটা জোয়ান পায়রা ডাস্টবিনের দিকে উড়ে গেল। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে বলল—না, উনুনের ছাই ছাড়া কিছু নেই। তবে একটা খবর আছে। ডাস্টবিনের পাশে একটা মরা পাখী পড়ে আছে। মনে হচ্ছে সেই ছোট পাখীটা। হোস্টেলের পাশ দিয়ে উড়ে আসবার সময় দেখলাম চাকরটা একটা পাখীর খাঁচা পরিষ্কার করতে করতে বলছে—এ কেমন বিদঘুটে পাখী। ভাল ভাল খাবার পেয়েও না খেয়ে মরে গেল!

সেইদিন মাঝরাতে ফাটকের ওপর থেকে প্রচণ্ড একটা শব্দ এল। ঘুমন্ত পাখীরা সেই শব্দে ভয়ে জড়সড় হয়ে গেল। কেউ কিছু বুঝতে পারছিল না ব্যাপারটা কি?

পরের দিন ভোরের প্রথম আলোয় তারা দেখতে পেল, ফাটকের ওপর দিকে অসুরটা নেই। সেখানে একটা গহ্বর তার আশপাশেও ফাটল ধরেছে। আর নীচের দিকে চেয়ে দেখল সেই অসুর মূর্তিটা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। *

* এইচ. এইচ. মুনরো রচিত 'দি ইমেজ অফ দি লস্ট সোল' গল্পের ছায়া অবলম্বনে।

অ্যাপিনের গবেষণা

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

আগস্ট মাসের আদ্ধেক পেরিয়ে গেল। এসময়ে শিকার করবার মত একটি পাখিও কোথাও মেলে না। ব্লেমলি প্রাসাদের দুই ডজন অতিথির হাতে করবার মত কোন কাজই নেই।

বিকালের দিকে বৃষ্টিও হয়ে গেল এক পশলা। ঠাণ্ডাও পড়েছে বেশ। এধার ওধার একটু যে বেড়ানো যাবে দল বেঁধে, তারও উপায় নেই। অগত্যা চায়ের টেবিলেই এসে জমে গিয়েছেন সবাই।

এ মজলিশে আকর্ষণের বস্তু যে একেবারেই নেই, তা কিন্তু নয়। কর্ণেলিয়াস অ্যাপিন বলে একটি লোক রয়েছেন। এতদিন তিনি ছিলেন হংসমধ্যে বকো যথা। প্রায় অজ্ঞাতকুলশীল বললেই হয়। কোন এক বন্ধুর বন্ধু সুপারিশ করেছিলেন গুণী লোক বলে। আজকের এই আসরে ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়েরা সবাই মিলে আবিষ্কারের চেষ্টা করছেন — গুণী লোকটার গুণপনা ঠিক কোন্ জাতীয়।

অ্যাপিন এসেছেন অন্য অতিথিদের কয়েকদিন আগেই, কিন্তু এ যাবৎ এতখানি মনোযোগ আর কোনদিন তাঁর দিকে কেউ দেয়নি। বাড়ির মালিকেরাও না, বাড়িতে সমাগত অতিথিরাও না। অনেকটা একঘরে গোছেরই ছিলেন তিনি। আর তারই দরুন তাঁর গবেষণা এগিয়ে যেতে পেরেছে এতখানি। আজ, সেই এগিয়ে যাওয়ার দরুনই আজ তিনি বকমধ্যে হংস।

হ্যাঁ, গবেষণাই বটে। আজ বলে নয়, অ্যাপিন নাকি গবেষণা করছেন আজ বিশ বচ্ছর। ব্লেমলি হাউসে আতিথ্যগ্রহণ করার আগেও তিনি নাকি কিছু কিঞ্চিৎ সাফল্য অর্জন করেছিলেন সে গবেষণায়, কিন্তু এখানে আসবার পরে ইদানীং এই কয়েকদিনে সে-সাফল্য একেবারে পরিপূর্ণতার কোঠায় গিয়ে পৌঁছেছে।

"কী? কী? ব্যাপারখানা কী?" জিজ্ঞাসা করে সবাই—"কী নিয়ে গবেষণা?"

"ইতর প্রাণীদের মুখ দিয়েও মানুষের ভাষায় কথা কওয়ানো যায় কিনা গবেষণাটা সেই বিষয়ে"—উত্তর দেন অ্যাপিন।

এরকম একটা আজগুবী উত্তরের জন্য কেউই তৈরী ছিল না। কেউ অট্টহাস্য করে উঠলেন সব শালীনতা চারদিকের হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে, কেউবা গুম মেরে গিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন অ্যাপিনের মুখের দিকে।

এটাও কি একটা গবেষণার বিষয় না কি? এতে যদি অ্যাপিন সাফল্য লাভ করে থাকেন, তবে বুঝতে হবে যে গবেষণা নয়। জাদুর চর্চা করেছেন তিনি এতদিন।

প্রশ্ন করলেন স্বয়ং গৃহস্বামী, স্যার উইলফ্রিড ব্লেমলি—"গবেষণাই হোক, আর জাদুই হোক, আপনি বলতে চাইছেন যে আপনার এতদিনকার চেষ্টা আমাদের এখানে আসবার পরেই পরিপূর্ণ সাফল্যে মণ্ডিত হয়েছে?"

"তা হয়েছে"—পরিতৃপ্তির হাসি হেসে জবাব দিলেন অ্যাপিন।

স্যার উইলফ্রিডের মুখে আর কথা যোগাচ্ছে না দেখে তরুণ অতিথি ক্লোভিস করল দ্বিতীয় প্রশ্ন—"এখানকার কোন্ ইতর প্রাণীর মুখ দিয়ে মানুষের ভাষা আপনি বার করলেন, তা আমাদের বলতে বোধ হয় আপনার আপত্তি হবে না?"

"আপত্তি?"—অ্যাপিন উত্তেজিত হয়ে ওঠেন—"নিউটন কি মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্ব লোকসমাজে প্রচার করতে আপত্তি করেছিলেন? না বাষ্পের শক্তি আবিষ্কার করবার পরে জেমস ওয়াট সেটা লুকিয়ে রেখেছিলেন নিজের মাথায়? আমি মানুষের ভাষা ব্যবহার করতে শিখিয়েছি আপনাদেরই প্রিয় বেড়াল ঐ টোবার মোরিকে।"

"টো-বা-র-মোরিকে?"—বিভিন্ন সুরে নানা বিচিত্র ঝংকারে কথাটা উচ্চারিত হল দুই ডজন কণ্ঠ থেকে।

"হ্যাঁ, লেডী ব্লেমলির পোষা ঐ হুলো বেড়ালটাকে প্রথম দিন দেখবার পরেই আমি ধারণা করে নিয়েছিলাম যে ওটি সাধারণ বেড়াল নয়, বেড়াল জাতের মধ্যে অতিবেড়াল। খানিকটা বাজিয়ে দেখতেই ওর প্রতিভা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলাম আমি। সেই থেকে যত্ন করে ওকে শিক্ষা দিচ্ছি, আর আশ্চর্য ফল পেয়েছি ওকে শিক্ষা দিতে গিয়ে। টোবার মোরি এখন কথা কইতে পারে যে কোন শিক্ষিত ভদ্রলোকের মত—"

অবাক্! নির্বাক্! হতবাক্ সবাই! এ যদি সত্য হয়, তবে—তবে আর দুনিয়ায় কোন কিছু জিনিসকে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না। টোবার মোরি কথা কইতে পারে মানুষের মত?

টোবার মোরির যিনি মালিক, সেই লেডী ব্লেমলি চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিলেন। কোথাও টোবার মোরির পাত্তা না পেয়ে স্বামীর দিকে চেয়ে মন্তব্য করলেন—"ওকে তা হলে একবার ডাকাই যাক না কেন?"

"অন্যদিন ত চায়ের টেবিলে থাকে সে! আজ বা নেই কেন?"—বলতে বলতে স্যার উইলফ্রিড নিজেই বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

চাকর-বাকর দিয়েও ডাকানো চলত টোবার মোরিকে। কিন্তু আজ আর তা

ডাকালেন না স্যার উইলফ্রিড। তিনি নিজেই খুঁজে বার করবেন এবং দেখা হলেই ওকে পরীক্ষা করে দেখবেন—সত্যিসত্যিই অ্যাপিনের দাবির কোন ভিত্তি আছে কিনা। যদি অ্যাপিনের অসাক্ষাতে বেড়ালটা কথা কইতে সক্ষম হয়, তা হলেই নিঃসংশয়ে মেনে নেওয়া চলবে যে অ্যাপিনের কথা সত্যি।

কিন্তু সে পরীক্ষার সুযোগ যদি আগেভাগে না পাওয়া যায়, এই ঘরে আসবার পরে টোবার মোরি যে কথা কইবে, তা টোবার মোরিরই কথা বলে মেনে নেওয়া নিরাপদ হবে না। ভেন্‌ট্রিলোকুইজম্ বলে জিনিস আছে একটা। স্বরবিক্ষেপ। অ্যাপিনের থেকে বিশ ফুট দূরে টোবার মোরি থাকুক, অ্যাপিন এমন ভাবে কথা কইবে যে মনে হবে বিশ ফুট দূরবর্তী টোবার মোরির গলা থেকে সে কথা বেরিয়েছে।

যেখানে অ্যাপিন থাকবে না, সেখানে ভেন্‌ট্রিলোকুইজমেরও কোন সম্ভাবনা থাকবে না। দেখা যাক তা হলে—

অ্যাপিনের এই অভিনব গবেষণার সম্বন্ধেই এলোমেলো কথা চলছে সব অতিথির মধ্যে। এমন সময় হন্ত-দন্ত হয়ে ফিরে এলেন স্যার উইলফ্রিড। একেবারে হাঁইফাঁই করতে করতে। এসেই চেয়ারে ধপাস্ করে বসে পড়ে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন—"অন্যের মুখ থেকে শুনলে বিশ্বাস করা কঠিন হত। কিন্তু আমি যে নিজের কানে শুনে এলাম! এ আর অবিশ্বাস করি কেমন করে?"

"কী? কী? কী শুনে এলে?"—লেডী ব্লেমলির প্রশ্নে অসীম উত্তেজনা।

"ওকে আমি পেলাম গিয়ে আমার পড়ার ঘরে। ডাকলাম—'টোবা মোরি, চা খাবি নে? আয়—'

"ও বলল 'সময় হলেই যাব। আমি যখন তখন খাইনে চা'—"

"অ্যাঁ? অ্যাঁ? অ্যাঁ?"—অব্যয়টা যেন সা-রে-গা-মায় বাজতে লাগল অতিথিমণ্ডলীর কণ্ঠে কণ্ঠে।

"এই কথা সত্যিই বলল টোবার মোরি?"—একটা দিশেহারা ভাব লেডী ব্লেমলির কথায়। স্বামীর নিজের কানে শোনা কথা, অবিশ্বাস কেমন করে করবেন? কিন্তু বিশ্বাস করতে যে সংস্কারে বাঁধছে।

স্যার উইলফ্রিডকে আর কষ্ট করে সন্দেহ ভঞ্জন করতে হল না স্ত্রীর। স্বয়ং টোবার মোরি ঘরে এসে ঢুকল হেলে দুলে।

তার জন্য একখানা টুল বরাবরই আলাদা করা থাকে খাবারের টেবিলে। সে ধীর পদক্ষেপে সেই টুলে গিয়ে উঠল এবং বসল। ভ্রূক্ষেপও করল না দুই ডজন অতিথির দিকে, যারা ভিড় করে বসে আছে টেবিলের দুই দিকে।

মেভিস বললেন—"আমার কথাই ধর না কেন!"
[পৃষ্ঠা ৮৭১

ভারী বিব্রত সবাই। যে ব্যাপার ঘটে গিয়েছে, তাতে টোবার মোরিকে আর স্রেফ বেড়াল বলে তুচ্ছ করা যায় না। যে মানুষের মত কথা কইছে, সে তো মানুষই! তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে দস্তুরমত বাধে। আবার তার চেয়েও বেশী বাধে, পোষা বেড়ালটার সঙ্গে সমকক্ষের মত কথা কইতে।

"একটু দুধ খাবে টোবার মোরি?" খুব সমীহ করেই আলাপ শুরু হল লেডী ব্লেমলির।

"তা খেলে আর দোষ কী?" পরম ঔদাস্যে জবাব দিল টোবার মোরি।

লেডী ব্লেমলি দুধ ঢালতে গেলেন একটা বাটিতে, হাত কেঁপে বেশ খানিকটা দুধ পড়েই গেল। "এ-হে-হে, ফেলে দিলাম যে?"—আপশোশ করে বলেন গৃহকর্ত্রী।

"হয়েছে কী তাতে?"—সান্ত্বনা দিল টোবার মোরি—"দুধ না হলে যে আমি মারা পড়ব, তা তো আর নয়!"

আবার সব কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত, হতবাক্। তারপর অতিথিদের মধ্যে সব চেয়ে যিনি বেশী বাচাল, সেই কুমারী রেস্কার নামলেন জেরা করতে, "তুমি তো আমাদের মানুষের ভাষাটা বেশ আয়ত্ত করে ফেলেছ দেখছি। শিখতে খুব কষ্ট হল না কি?"

টোবার মোরি দুই চোখ বিস্ফারিত করে কয়েকমুহূর্ত তাকিয়ে রইল রেস্কারের দিকে। তারপর দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে দিল খোলা জানালার পানে। ভাবখানা স্পষ্টতঃই এইরকম—"বাজে প্রশ্ন কর না, ওসবের জবাব দিতে ভাল লাগে না আমার?"

এবার পালা কুমারী মেভিসের। তিনি আর কোন লাগসই প্রশ্ন হাতের নাগালে না পেয়ে বলে বসলেন—"মানুষের বুদ্ধিশুদ্ধি সম্বন্ধে ধারণা কী তোমার?"

টোবার মোরির স্বর একেবারে বরফের মত নিরুত্তাপ—"কোন একজন বিশেষ মানুষের নাম যদি করেন, তবে তার বুদ্ধিশুদ্ধি সম্বন্ধে মন্তব্য করা সহজ হয়—"

অতি কষ্টে একটুখানি কাষ্ঠহাসি হেসে মেভিস বললেন—"আমার কথাই ধর না কেন!"

"ভারী মুশকিলে ফেললেন তাহলে"—বলল টোবার মোরি। বলল বটে, মুশকিলের কথা, কিন্তু তার কথার সুরে বা মুখের ভঙ্গীতে মুশকিলের আভাস তিলমাত্র পাওয়া গেল না। "ভারী মুশকিলে ফেললেন আমায়। এই বাড়িতে এই যে আপনারা সবাই নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন আজ, এ নিমন্ত্রণ থেকে আপনি ত প্রায় বাদ পড়েই গিয়েছিলেন। স্যার উইলফ্রিড বলেছিলেন—'ও মেয়েটার মগজে বুদ্ধি বলে কোন বস্তুই নেই। ওকে এনে কী হবে?' তা ধরুন, আমার মালিকের যা মত আপনার সম্বন্ধে, আমারও তাইই।"

টেবিলসুদ্ধ লোক বিব্রত আড়ষ্ট, কেউ কারও মুখের দিকে চাইতে পারছে না, পাছে মুখ দিয়ে হাসি বেরিয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে হাসা তো রীতিমত অসভ্যতাই হবে।

অবশেষে মেভিসই কথা কইল আবার, রীতিমত ঝগড়ার সুরেই কথা কইল, "বলি, ঐ রকমই যদি কর্তার মত থাকবে আমার সম্বন্ধে, তবে আমার নিমন্ত্রণটা হল কেমন করে? কেমন করে হল?"

"ঐ বুদ্ধির অভাবের জন্যই হল"—নির্বিকারভাবে জবাব দিল টোবার মোরি। "লেডী ব্রেমলি বললেন—বোকা-ছোকা মানুষ দুই একজন দরকার আমাদের। ঐ ভাঙ্গা গাড়িটা গছাবার জন্য। বাজারে ওর খদ্দের জুটবে না। মেভিসকে পটাতে পারলে প্রায় নতুনের দামই আদায় করা যাবে তার কাছ থেকে—"

লেডি ব্রেমলি হয়ত এসব অপবাদ ঝেড়েই অস্বীকার করতেন। কিন্তু ভেবে দেখলেন, তা আর করার উপায় নেই, কারণ সেদিনই সকালে তিনি কথাপ্রসঙ্গে মেভিসকে বলেছেন—"তোমার ও পাড়াগাঁয়ে, আমারই ছোট গাড়িখানার মত একখানা গাড়ি যদি রাখ, দেখবে কী চমৎকার কাজ পাও—"

টেবিলের হাওয়া গরম হয়ে উঠছে দেখে আধা-বয়সী মেজর বারফিল্ড এগিয়ে এলেন কথার মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্য। নিজেকে তিনি রসিক লোক বলে মনে করেন। রসিকতারই চেষ্টা করলেন এক হাত "আস্তাবলে যে ডোরাকাটা মেনীটি আছে, শুনলাম তুমি তাকে বিয়ে করতে চাইছ। কত দূর এগুলো ব্যাপারটা?"

টোবার মোরি গম্ভীর হয়ে বলল—"এরকম সব আলোচনার জায়গা প্রকাশ্য মজলিশ নয়। আপনি এ বাড়িতে এসে অবধি কোন্ কুমারীর কতখানি নেকনজর লাভে ধন্য হয়েছেন, সে প্রশ্ন তুললে আপনি কি বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন, বলতে চান?"

মেজর সাহেব অধোবদন, একটা চাপা হাসির গুঞ্জন সারা টেবিলে। কিন্তু হাসির বহর যার যতখানি, বুকের ভিতর ধুকধুকুনিও তার ততখানি। অতিথিদের ঘরগুলি সবই পুবের মহলে। পিছন দিকে সারি সারি জানালা, জানালার পিছনে একফালি টানা বারান্দা। কোমর-সমান উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। সেই দেয়ালের মাথাটা যে টোবার মোরির বেড়াবার জায়গা, তা অতিথিরা সবাই লক্ষ্য করেছেন। কার ঘরের ভিতর কী হচ্ছে, কিছুই অজানা নেই পাজী বেড়ালটার।

কথা আর কারও মুখ দিয়ে বেরুতে চাইছে না। কেবল মাঝে মাঝে হাসির উচ্ছ্বাস একটু একটু। বুকের ধুকধুকুনি যাতে পাশের লোকটি টের না পায়, তারই জন্য চেষ্টা করে কয়ে হাসছে এক একজন।

চায়ের টেবিলের আসর এ অবস্থায় ভেঙ্গে দেওয়াই সংগত মনে করছেন লেডী ব্লেমলি। প্রস্তাবটা জিভের ডগায় এসেছে সবে, এমন সময়ে টোবার মোরি এক লাফে টুল থেকে জানালায় গিয়ে পড়ল। নীচের বাগানে আস্তাবলের ডোরাকাটা পুষির লেজটা দেখা যায় যেন। টোবার মোরি যা একখানা লাফ দিল, একেবারে দোতলা থেকে নীচে!

আসর ভঙ্গ করার আর দরকার বুঝল না কেউ। উৎপাত আপাততঃ বিদায় হয়েছে। স্যার উইলফ্রিডই কথা কইলেন—"ওকে নিয়ে এখন কী করা?"

যাচাল ক্লোভিস প্রস্তাব করল—"স্ট্রিকনিন খাইয়ে মেরে ফেলা"—

লেডী ব্লেমলি বিষণ্ণ, অ্যাপিন মর্মাহত। কিন্তু স্যার উইলফ্রিডও যখন সায় দিলেন ক্লোভিসের কথায়, তখন অ্যাপিন আর কী করবে?

অ্যাপিন বিদায় হয়ে গেল, তার সার্থক শিষ্য টোবার মোরির অপঘাত মৃত্যু সে আর নিজের চোখে দেখবে না।

অনেকেরই ইচ্ছে ছিল ওকে ধরে রাখা, এবং টোবার মোরির মত ওকেও এক মাত্রা স্ট্রিকনিন খাইয়ে দেওয়া। দুনিয়াটাকে উলটে পালটে দেবার তালে আছে ভবঘুরেটা।

তা স্ট্রিকনিনে মরাই বোধহয় ভাল ছিল অ্যাপিনের। তা হলে হাতীর পায়ের তলায় পিষে মরার কষ্ট তাকে সইতে হত না। গিয়েছিল লণ্ডন পশুশালায়। কথা শেখাচ্ছিল সেখানকার এক হাতীকে। ইংরেজী সিনট্যাক্স ঘাঁহাতক শেখাতে যাওয়া, মাথা ঘুরে গেল বেচারা ছাত্রের। শুঁড়ের এক প্যাঁচ মেরে গুরুকে সে শূন্যে তুলে ফেলল এবং তার পরই—

গবেষকমহলে অ্যাপিনের শূন্যস্থান সেই থেকে শূন্যই রয়ে গিয়েছে! *

---

* স্যাকি (এইচ. মনরো) রচিত "টোবার মোরি" অবলম্বনে।

সব্যসাচী

১০

এক মুহূর্তে রণস্থলের হাওয়ায় বিদ্যুৎ যেন চমকে গেল অলক্ষ্যে। শুধু যে চমকে যাওয়া, তাও নয়। মিলিয়ে যাওয়ার পরেও তার দাহ যেন জ্বলতেই থাকল আকাশে বাতাসে। উদগ্র উত্তেজনায় অধীর উন্মাদ হয়ে উঠছে দুই পক্ষেরই মানুষ-জন্তু; কে কার টুঁটি ছিঁড়ে রক্ত খাবে, মনে মনে বিচার চলছে তারই শুধু।

টোমোস মারাত্মক আহত, সিংহরথের উপরে নেতিয়ে পড়েছেন অজ্ঞান হয়ে। ওদিকে ভ্যালথরও যন্ত্রণায় অধীর। বল্লম গভীরভাবে বিদ্ধ হয়েছে তার কাঁধে, জ্ঞান না হারালেও মাথা ঠিক রেখে সৈন্য চালনার নির্দেশ দেওয়া তার পক্ষে আর সম্ভব নয়।

অ্যাথনি বাহিনীরই জয়লাভের সম্ভাবনা দেখা যায় এই মুহূর্তে। কারণ দারুণ হঠকারিতার পরিচয় দিয়ে টোমাস এসে পড়েছিলেন শত্রুব্যূহের একেবারে মর্মস্থলে। এখন নিজে তিনি আহত, হতজ্ঞান, কতিপয় অনুগামী যারা এসেছিল তাঁর পৃষ্ঠরক্ষার জন্য, তারা একে একে হস্তীপদতলে পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারাচ্ছে। সিংহ চতুষ্টয় ক্রমাগত গর্জন করে চলেছে বটে, কিন্তু লোকের কানে তালা লাগিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোন কাজ হচ্ছে না। তারা যে হাজার হাতীর বেষ্টনীর মাঝখানে মাত্র চারটি। এ-সম্বন্ধে তারা নিজেরাও যেমন সচেতন, হাতীরাও তেমনি। বেচারীরা যে লাফিয়ে কোন হাতীর শুঁড় কামড়ে ধরবে বা পেটে নখ বসিয়ে দেবে, তারও উপায় নেই। কারণ রথের সঙ্গে এখনও তারা দড়িদড়া দিয়ে বাঁধা।

হাতী থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে অ্যাথনির সৈনিকেরা নেমে পড়ছে টোমোসের রথে। সিংহগুলোকে কুপিয়ে মারছে খাঁড়া দিয়ে, রথ থেকে টোমোসকে টেনে তোলার চেষ্টা করছে হাতীর পিঠে, বাঁচুন বা মরুন, তাঁকে তারা অ্যাথনিতে নিয়ে যেতে কৃতসংকল্প।

"এবার আর রানীর চাতুরী খাটছে না"—বলল একটা অ্যাথনির সৈনিক।

"না। যুবরাজ ত প্রায় অজ্ঞান। রানী আর দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করবেন কাকে?"

রানী নিমোনিও সে-খবর পেয়েছেন। টোমোস সব দিক দিয়ে ডুবিয়েছেন ক্যাথনিকে। নিজে ত মরণের পথে পা বাড়িয়েছেনই, ভ্যালথরকে করেছেন ঘায়েল। প্রতিবার ঐ ভ্যালথরের সৌজন্যবোধের জন্যই হেরে হেরেও জিতে যায় ক্যাথনি। রণদেবতা বিমুখ হচ্ছেন দেখলেই বীরসাজে সেজে নিমোনি চলে আসেন সিংহসেনার পুরোভাগে, দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে ভ্যালথরকে। আর ভ্যালথর?

বীর মহাপ্রাণ, নারী-অঙ্গে অস্ত্রাঘাতের কথা ভ্যালথর কল্পনাও করতে পারেন না। নিমোনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেই প্রতিবার তিনি হেসে জবাব দিয়েছেন—"আমি বিনাযুদ্ধে তোমার কাছে পরাজয় স্বীকার করছি রানী। তুমিই জিতলে।" সঙ্গে সঙ্গে গজবাহিনী অপসৃত হয়েছে থেনারের অভিমুখে। যুদ্ধে হেরে গিয়েও অন্তঃরবাসীরা বিজয়োল্লাসে ফিরে গিয়েছে ক্যাথনিতে।

একেই জেমনন বলেছিল রানীর চাতুরী।

এবার নিমোনি আর এ-খেলা খেলার উৎসাহ বোধ করছেন না। শত্রুপক্ষের সব সেনানী ত আর ভ্যালথরের মত শিষ্ট ব্যক্তি নয়। শত্রুকে সৌজন্য দেখানোর অপরাধে নিজের দেশে ভ্যালথরকে নিন্দিত হতে হয়েছে, এরকম জনশ্রুতিও কানে এসেছে নিমোনির। হয়ত সেই অসংগত নিন্দাতেই ক্ষুব্ধ হয়ে দেশত্যাগ করেছিল ভ্যালথর।

যাক। টোমোস সাংঘাতিক আহত, অচৈতন্য এবং বন্দী। ক্যাথনির সেনা নিমোনির মুখ চেয়ে এখনও দাঁড়িয়ে আছে রণক্ষেত্রে। পূর্বাপর যে চাতুরী তিনি খেলে আসছেন, তারই মত একটা কিছু খেলা দেখবার আশায়। যদি তাতে হতাশ হতে হয়, তারা একটু বাদেই ছত্রভঙ্গ হবে। তাই দস্তুর। সেনাপতি না থাকলে সৈন্যেরা যুদ্ধ করে না।

নিমোনি কিন্তু নিশ্চিন্ত। তিনি নিজে কিছু করছেন না, কারণ যা কিছু কর্তব্য বলে বিবেচনা করবে, তাই করবার পূর্ণ স্বাধীনতা তিনি ইতিপূর্বেই দিয়ে রেখেছেন একজনকে। সে একজন—

সে নিশ্চিন্ত নেই। পরাজয়ের মুখ থেকে জয়কে ছিনিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি টারজান দিয়েছিল নিমোনিকে। আশ্চর্য কথা নিশ্চয়ই, সে-প্রতিশ্রুতিকে অবিশ্বাস করেন নি রানী।

সে-বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবে টারজান।

বর্ণনায় বিশ্লেষণে কাল কেটে যায় অনেক, কিন্তু কর্মঠ পুরুষের এক সেকেণ্ডও লাগে না নীরব দর্শকের ভূমিকা ত্যাগ করে কর্মসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে। পাশ দিয়ে কে ছুটে যায় ও?

টারজান লাফ দিয়ে উঠে বসল বেলসারের পিঠে।

বেলসার! অন্তার উপত্যকার শ্রেষ্ঠ কেশরী! দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সে ছুটেছে যে কোন একটা হাতীর কুম্ভবিদারণের জন্য। পশু ত!

টারজান লাফ দিয়ে উঠে বসল তার পিঠে।

বেলসার একটা চাপা গর্জন করে ঘাড় বাঁকালো। করাতের দাঁতের মত দু'পাটি দাঁত ঝকমকিয়ে উঠল দারুণ জিঘাংসায়। এই আচমকা-লাফিয়ে-পড়া সওয়ারকে সে চিনেছে। ক্যাথনির লোক এ নয়। যে সমাজের মানুষকে আপন বলে জানে বেলসার, সে-সমাজের সঙ্গে যে কোন সম্পর্কই এর নেই, তা বেশ জানে বেলসার। এ একটা বহিরাগত লোক। দুশমনই নিশ্চয়। গায়ের গন্ধে মালুম হয়, এরই তীরে কান কাটা গিয়েছিল বেলসারের মাত্র এই দুই তিন ঘণ্টা আগে। শত্রু! শত্রু! অতএব বধ্য!

কিন্তু বাধা আছে আপাততঃ একে বধ করার। ক্যাথনির সিংহেরা সবাই সুশিক্ষিত। বিশেষ করে বেলসার, রানীর অতি পেয়ারের পশুরাজ, সারা মুলুকের সিংহবংশে আদর্শ

সিংহ, তাকে ত উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত, সর্ববিদ্যায় বিদ্যাসাগরই বলা যায় একরকম। সিংহদের আচরণীয় কর্মপদ্ধতির অন্যথা সে করবে না কখনো।

এখন সে-পদ্ধতির অন্যতম অনুশাসন হল এই যে ক্যাথনির যে-কোন লোক একবার যদি পিঠে সওয়ার হয়ে বসে, তবে সে স্বেচ্ছায় নেমে না যাচ্ছে যতক্ষণ, বাহন তাকে কখনো পিঠ থেকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করবে না, বরঞ্চ সর্বপ্রযত্নে মেনে চলবে সেই সওয়ারের নির্দেশ। এ নিয়ম মেনে না চললে সিংহ আর মানুষের সহযোগিতার বন্ধন বজায় থাকে কেমন করে? আর তা যদি বজায় না থাকে, তা হলে অন্তার রাজ্যের রাষ্ট্রকাঠামোই ভেঙ্গে পড়ে খান খান হয়ে।

অতএব বেলসার না মেনে পারে না সে-অনুশাসন। রানী নিমোনির অনেক ভরসা আর শৌর্য সাহস আর জ্ঞান বুদ্ধির উপরে, তা বিলক্ষণ জানে এই মহাসিংহ। ব্যক্তিগত আক্রোশের বশবর্তী হয়ে যুদ্ধের সময় সে পিঠ থেকে ফেলে দেবে না এই অবাঞ্ছিত আগন্তুককে, যদিও কাটা কানের জ্বালা কম জ্বালা নয়।

সিংহের পিঠে সওয়ার হওয়ার অভ্যাস টারজানের ত পূর্বাপরই রয়েছে! ইদানীং ত জাবাল্‌জা তাকে পিঠে তুলে সারা ওয়াজিরিস্তান টগল দিয়ে বেড়াতে ভালবাসত! কিন্তু জাবাল্‌জার জন্মের আগে থেকেই প্রয়োজন বোধে বন থেকে সিংহ ধরে তার পিঠে চেপে বসা টারজানের ছিল নিত্যকর্ম। গাছের ডালে ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে চলার সুযোগ যেখানে অনুপস্থিত, এমন সব ছোট বন পাড়ি দিতে হলে সিংহকেই বাহন হিসাবে ব্যবহার করা টারজানের রেওয়াজ ছিল। কাজেই সিংহকে ঘোড়ার মত চালাবার কায়দা সে জানে।

বেলসারের বাঁয়ের পাঁজরে অল্প করে পায়ের একটু ঘষা দিতেই সে তীরবেগে ডাইনের দিকে ছুটল। ঐদিকেই টোমোস বন্দী হয়েছেন, এবং ভ্যালথর তীব্র যাতনায় কাতরাচ্ছে।

সিংহবাহন একটা দৈত্যাকার পুরুষকে একাকী গজবাহিনীর সম্মুখীন হতে দেখে স্বভাবতঃই অ্যাথনিওয়ালারা তাকে শত্রুবৎ সম্ভাষণ জানবার জন্য তৈরী হল। লোকটার গায়ে যে সোনার বা গজদন্তের কোন বর্মই নেই, এটা লক্ষ্য করে যেমন তারা চমৎকৃত, তেমনি পুলকিত। বল্লমের পাল্লার ভিতর আসা মাত্র বিশখানা বল্লমে বিদ্ধ হয়ে ঐ কিম্ভূত-কিমাকার জীবটা ধরাশায়ী হবে।

নিজের সে-বিপদ সম্বন্ধে টারজানও যথেষ্ট সচেতন। অথচ টোমোসের রথ পর্যন্ত তাকে পৌঁছোতেই হবে। হাতকাটা ক্যাথনি সেনাপতিকে বেঁধে অ্যাথনিতে নিয়ে যাবার সব তোড়জোড়ই করে ফেলেছে শত্রুরা। হাতী তৈরী তার জন্য।

এদিকে ক্যাথনির সেনাও বুঝি তৈরী পিছু হটবার জন্য। সেনাপতি নেই, রাণীও রণসজ্জায় সেজে বেরুচ্ছেন না। সুতরাং—তারা আর দাঁড়িয়ে থেকে করে কী? যুদ্ধ? কার সঙ্গেই বা যুদ্ধ? টোমোসকে নিয়ে হাতীর দল ত এক্ষুণি রওনা হয়ে পড়বে খেমারের দিকে!

কিন্তু না, তা আর হতে পেল না।

বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত একটা বিকট হুহুঙ্কারে দীর্ণবিদীর্ণ হয়ে গেল আকাশ পৃথিবী। রণহস্তীর গর্জন এ নয়, নয় রণোন্মাদ কেশরীরও। তবে? এরকম ভৈরব রোল কোন জন্তুজানোয়ারের কণ্ঠ থেকে কেউ কখনো শোনে নি। এ হল মদমত্ত মহাকপিদের যুদ্ধযাত্রার জিগির।

শত্রুমিত্র সকলের দৃষ্টি একসাথে পড়ল রণক্ষেত্রের একটা বিশেষ স্থানে। পিঙ্গল বর্ণ মহাসিংহ বেলসার তীরবেগে ছুটে আসছে, সেটা এমন কিছু আশ্চর্য দৃশ্য নয়। আশ্চর্য হল এই যে ছুটন্ত সিংহটার পিঠের উপরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা শ্বেত দৈত্য। তার এক পা বেলসারের কাঁধে, আর এক পা প্রায় কটিতে। সেই ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আকাশের পানে মুখ তুলে ঐ দৈত্যই কণ্ঠ থেকে বার করছে অপার্থিব ঐ নির্ঘোষ, পৃথিবীর সর্বজীবের ধমনীর রক্ত যা শুনে হিম হয়ে যাচ্ছে ত্রাসে আর বিভীষিকায়।

সে-বিভীষিকায় ঘোর চোখ থেকে কেটে যাওয়ার পরে অ্যাথনির সৈনিকদের হুঁশ হল যে সিংহের সওয়ার দানবটা একেবারে তাদের হাতের নাগালে এসে পড়েছে। এত কাছে যে তাক করে বল্লম ছোঁড়ার সময় নেই আর। এলোপাতাড়ি তীর চারখানা ছুটল তবু, তবে সে শুধু ওদের নিজের মনকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই।

কাছে এসেই বেলসারের পিঠ থেকে উপর পানে লাফ দিল টারজান। ভ্যালথরের হাতী দলের একেবারে পুরোভাগে। তার কটিবন্ধ দড়িগাছটা ধরে তড়াক্ করে উঠে বসল হাতীর পিঠে। এদিকে সওয়ারের শাসন থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বেলসার বোঁ করে ঘুরে গিয়েছে খোলা মাঠের দিকে। একা এই হস্তীযূথের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার মত বোকামি যে আর কিছুই হতে পারে না। এ-বিষয়ে তার জ্ঞান আছে টনটনে।

টারজান ততক্ষণ হাওদায় বসে প্রায় হতজ্ঞান ভ্যালথরকে ডাকছে—"ভ্যালথর! বন্ধু!"

সে-পরিচিত কণ্ঠস্বর অর্ধমূর্ছার ঘোর ক্ষণকালের জন্য কাটিয়ে দিল ভ্যালথরের। চোখ মেলে সে আনন্দে বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল—"টারজান? বন্ধু? বেঁচে আছ তুমি?"

"আছি। একটা প্রার্থনা তোমার কাছে আছে টারজানের। তোমার গজ-বাহিনীর সৈনাপত্য আমায় দাও।"

"সৈনাপত্য ?"– দস্তুরমত অবাক্ ভ্যালথর।

"তোমার দেশের, তোমার সৈন্যদের, তোমার হস্তীযূথের কোন ক্ষতি হবে না, এ আমি কথা দিচ্ছি তোমায়! আমার কথায় যদি বিশ্বাস করতে পার তুমি, পূর্বকথা স্মরণ করে--"

"আমার জীবনদাতা তুমি। তোমায় আমি বিশ্বাস করতে পারব না? যা তুমি চাইছো, এই নাও তা। অ্যাথনির ক্ষতি তুমি করবে না, তা আমি জানি।" এই বলে মাথার মুকুট খুলে টারজানের মাথায় পরিয়ে দিল ভ্যালথর। মুকুটের ঐ হীরাখানাই সৈনাপত্যের অভিজ্ঞান।

"তুমি চুপ করে হাতীর পিঠেই শুয়ে থাকো"—বলল টারজান—"এই যুদ্ধের ঝামেলাটা মিটিয়েই তোমার কাঁধের বল্লম আমি খুলে নেব।"

ততক্ষণে টোমোসের হতচেতন দেহ অন্য একটা হাতীর পিঠে তোলার জন্য তৈরী হয়েছে অ্যাথনিওয়ালারা। টারজান দাঁড়িয়ে উঠল হাওদার উপরে। মুকুটের হীরার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দুন্দুভিনাদে সম্বোধন করল গজবাহিনীকে—"সৈনিকগণ। তোমাদের নব সেনাপতি টারজানকে নিরীক্ষণ কর। ভ্যালথর সেনা-চালনার ভার আমার উপর দিয়েছেন। আমার প্রথম আদেশ, ক্যাথনির সেনাপতি টোমোসকে আবার বন্দী কর তাঁর সিংহরথে, নির্বিবাদে তাঁকে চলে যেতে দাও তাঁর সৈন্যদের কাছে।"

গজবাহিনীতে একটা স্তম্ভিত ভাব। অদূরে চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়িয়ে আছে সিংহবাহিনী। এই অচিন্ত্যপূর্ব পরিস্থিতি তাদের কোন্ পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে, তা তারা বুঝতে পারছে না।

পাশের হাতীতেই তোলা হচ্ছিল টোমোসকে। টারজানের হাতের নাগালের ভিতর দাঁড়িয়ে সৈনিকেরা নতুন সেনাপতির আদেশে অবজ্ঞা দেখাতে সাহস করল না। ধীরে ধীরে তারা টোমোসের দেহটা নামিয়ে দিল তার সিংহরথে। কিন্তু সেইক্ষণে বহুকণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল একটা সমুচ্চ ধিক্কার।

"বিশ্বাসঘাতকতা। কে ঐ উলঙ্গ মানুষটা? যুবরাজের এখন ভাল-মন্দ জ্ঞান লোপ পেয়েছে। তা নইলে অজানা অচেনা একটা লোককে সৈনাপত্যের ভার দেন? এমন লোককে, যার বাড়ি অ্যাথনিতে নয়? ও ক্যাথনির চর, ওকে হাতীর পায়ের তলায় ফেলে দাও।"

ভ্যালথর তখন অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। সে ঐ ধিক্কারের কোন প্রতিবাদ করতে পারল না। টারজানের চারদিকে অ্যাথনি বাহিনীর অন্ততঃ অর্ধেক সৈনিক স্পষ্টতঃই বিদ্রোহের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। তাদের নেতৃত্ব নিয়েছে যে-লম্বা লোকটা, টারজান পরে তার

পরিচয় পেয়েছিল বইকি! নাম তার মেহুমান, সক্ষম সৈনিকই বটে সে। ভ্যালথর যখন বনে বনে ঘুরছে পথ হারিয়ে, তখন অন্যায় আক্রমণের অভিযানে অ্যাথনিরাজ একেই অর্পণ করেছিলেন সৈনাপত্যের ভার। গতরাত্রে তারই পরিচালনায় অ্যাথনিবাহিনী এসে প্রবেশ করে শহীদ গিরিসংকটে। কিন্তু একান্ত দৈবই সেই সঙ্গীন সময়ে ভ্যালথরকে এনে হাজির করল ঠিক সেই জায়গাটিতেই। ভ্যালথরকে দেখামাত্রই সৈন্যেরা সবাই একবাক্যে ঘোষণা করল—তারা তাঁকেই পেতে চায় সেনাপতি হিসাবে। তা ছাড়া অ্যাথনির শাসনতন্ত্রের চিরকেলে প্রথাই এই যে রাজবংশে সক্ষম পুরুষ যে থাকবে, সেনাপতির পদ তারই প্রাপ্য হবে।

"বন্ধু গজরাজেরা! কার উপরে আক্রমণ চালাতে আসছ তোমরা?" [পৃষ্ঠা ৮৮০

মেহুমানকে প্রশংসা করতে হয়, করগত সৈনাপত্য হাত থেকে ফসকে যাওয়া সত্ত্বেও সে ভ্যালথরের বিরুদ্ধে কোন বিদ্বেষ পোষণ করে নি, এ-যাবৎ বিশ্বস্তভাবেই ভ্যালথরের নির্দেশ পালন ও সহযোগিতা করেছে। কিন্তু এখন? একটা অচেনা বিদেশীর হাতে সৈনাপত্য চলে যাবে, এটা নীরবে দাঁড়িয়ে সহ্য করে যাওয়া তার পক্ষে কি সম্ভব? রাজা তাকেই নিযুক্ত করেছিলেন সেনাপতি পদে, সে স্বেচ্ছায় সে-সম্মান ত্যাগ করে সরে দাঁড়িয়েছিল শুধু ভ্যালথরেরই খাতিরে। এখন ভ্যালথর যখন সৈন্য চালনায় অপারগ হয়ে পড়েছেন, তখন সে-সম্মান মেহুমানের হাতেই ফিরে আসা কি উচিত নয়?

ভ্যালথর টারজানকেই মনোনীত করেছেন, তা ঠিক। কিন্তু ভ্যালথর সজ্ঞানে তা করেছেন কিনা, সন্দেহ আছে ঘোরতর। নব-সেনাপতি মনোনয়ন ঘোষণার সময় তাঁর মাথার ঠিক ছিল না নিশ্চয়ই। প্রমাণ? প্রমাণ এই যে ঘোষণাটি মুখ থেকে বেরুতে না বেরুতেই ভ্যালথর একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন।

অতএব, টারজানকে সেনাপতি বলে মানবে না গজবাহিনী। মুক্তি দেবে না টোমোসকেও। প্রথমে অল্পসংখ্যক সৈনিকই মেহুমানের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়েছিল। কিন্তু দেখতে দেখতে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল সমগ্র সেনা। এমন ধ্বনিও উঠল—"ক্যাথনির চর ঐ বিদেশী বর্বরকে হত্যা কর এক্ষুণি—, হাতীর পায়ের তলায় ফেলে দাও ওকে।"

অদূরে দাঁড়িয়ে ক্যাথনির সিংহবাহিনী মজা দেখছে নাকি? গজসেনার এই আভ্যন্তরীণ বিরোধের সুযোগ নিয়ে তারা শত্রুপক্ষকে আক্রমণ কেন করে না?

তাদের পক্ষের জবাব-হল এই যে আক্রমণের আদেশ ত দিচ্ছে না কেউ। টোমোসের অদর্শনের পর কে যে সিংহবাহিনীর নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত আছে, তাই ত বুঝতে পারছে না ক্যাথনির সৈন্যেরা। রানীও নির্বিকার।

কিন্তু ক্যাথনি সেনা যা-ই করুক, তাদের নিয়ে এখন মাথা ব্যথা নয় টারজানের। মেহুমান সমগ্র গজসেনাকে লেলিয়ে দিয়েছে তার উপরে। শুঁড় তুলে বিকট চিৎকার শুরু করেছে রণহস্তীরা। মাহুতেরা অঙ্কুশ দিয়ে তাদের কর্ণমূল স্পর্শ করেছে কি না করেছে, তারা গর্জন করে ধাবিত হল টারজানের দিকে।

আর তক্ষুণি ঘটল সেই ঘটনাবহুল দিবসের সবচেয়ে লোমহর্ষণ ঘটনা। মানুষ টারজানের কণ্ঠ থেকে বেরুলো হাতীর বৃংহন। শৈশবে অকৃত্রিম সুহৃদ গজরাজ ট্যাণ্টরের কাঁধে চড়ে যখন সে অরণ্য-পরিক্রমা করত, তখনই, সেই বন্ধুর কাছেই হস্তী-ভাষা শিক্ষা টারজানের। এতদিন পরে আজ কাজে লেগে গেল চরম সংকটের মুহূর্তে—।

"বন্ধু গজরাজেরা! কার উপরে আক্রমণ চালাতে আসছ তোমরা? আমিও যে তোমাদের একজন। এই দ্বিপদ দেহ আমি ধারণ করেছি আরণ্যজাদুর বলে, আরণ্য দেবতা বোঙ্গার আশীর্বাদের ফলে। এটা আমার ছদ্মবেশমাত্র। আসলে আমি তোমাদেরই একজন, মধ্য মহাদেশের মহারণ্যপতি ট্যাণ্টরের অভিন্ন হৃদয় সখা। তোমরা আমার কথা শুনবে? না, মেহুমানের?"

"ট্যাণ্টরের জ্ঞাতি বন্ধুরা ট্যাণ্টরের সখার কথাই শুনবে—" বলে একসাথে গর্জে উঠল হাজারটা হাতী।

মাহুতের অঙ্কুশে কোন হাতীই আর ভ্রূক্ষেপ করল না। মেহুমান আর তার সৈন্যেরা পশ্চাৎপদ হল তাদের চতুষ্পদ যোদ্ধাদের এই আকস্মিক বিদ্রোহ দেখে। টারজানের নেতৃত্বে হাজার হাতী অ্যাথনির দিকে ফিরে চলল হতচেতন ভ্যালথরকে নিয়ে।

টোমোসের সিংহরথ ফিরে গেল সিংহবাহিনীর দিকে। মেহুমানের সাধ্য হল না তাকে রুখবার। হাতীদের আশ্রয় হারাবার পরে সিংহসেনার সম্মুখীন হওয়ার সাহস কোথায় তার?

(ক্রমশঃ)

রূপকথার আলেকজাণ্ডার

বিমলেন্দু দাশগুপ্ত

আজ থেকে তেইশশো বছর আগে গ্রীস দেশে আলেকজাণ্ডার জন্মগ্রহণ করেছিলেন ও দিগ্বিজয়ী হয়েছিলেন। তাঁর মত সুখ্যাতি আর কোন দিগ্বিজয়ীর ভাগ্যে জোটেনি, তাছাড়া তাঁর সম্বন্ধে এত গল্প ও রূপকথা প্রচলিত আছে যে তাও তুলনাবিহীন! আরব ও ইহুদীদের প্রাচীন গ্রন্থে আলেকজাণ্ডারকে অনেক উঁচুস্থান দেওয়া হয়েছে। মুসলমানদের পবিত্র কোরানে আলেকজাণ্ডারের উল্লেখ আছে। এই সেদিনও মালয় দেশের মুসলমান শাসনকর্তারা নিজেদের সেকেন্দারের বংশধর বলে দাবি করতেন।

মধ্যযুগে ইউরোপে আলেকজাণ্ডারকে নিয়ে খুব মাতামাতি শুরু হয়েছিল। তখন তাঁর সম্বন্ধে কয়েকটি রূপকথা সৃষ্টি হয়েছিল; তার মধ্যে একটি এই—তিনি যখন সসৈন্যে ছিরকানসিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন আমাজন দেশের রানী তাঁকে বাধা দিতে এগিয়ে আসেন। কিন্তু আলেকজাণ্ডারের সুঠাম দেহ ও পৌরুষব্যঞ্জক মূর্তি দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিয়ে করতে চান! আলেকজাণ্ডার এই প্রস্তাবে রাজী হন এবং আমাজনদের রানী আলেমটিসকে বিয়ে করেন।

ইহুদীদের একটি প্রাচীন গ্রন্থে আলেকজাণ্ডারের স্বর্গ অভিযানের গল্প আছে। গঙ্গা নদী স্বর্গ হতে প্রবাহিত হয়েছে—এই বিশ্বাসে তিনি একখানি নৌকায় কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে স্বর্গ অভিমুখে রওনা হয়েছিলেন। অনেকদিন চলার পর তিনি এক পাঁচিল ঘেরা শহরের কাছে এসে পড়েন এবং তিন দিন তিন রাত ক্রমাগত নৌকা বেয়েও সেই শহরে প্রবেশের কোন পথ পাননি। চতুর্থ দিনে সেই পাঁচিলের গায়ে একটা ছোট্ট জানালা দেখতে পান এবং তাতে আঘাত করতে থাকেন।

কিছু সময় আঘাত করার পর জানালাটা খুলে যায় এবং একজন দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ মুখ বাড়িয়ে বলে—কেন জ্বালাতন করছ? ধর্মাত্মা ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ এ শহরে ঢুকতে পারে না। এরপর সেই বৃদ্ধ আলেকজাণ্ডারকে ধর্ম সম্বন্ধে মামুলী উপদেশ দিয়ে একখণ্ড মূল্যবান পাথর উপহার দিয়েছিলেন। এই পাথরই ইতিহাসে 'ওয়াণ্ডার স্টোন' নামে খ্যাত। এই পাথরের গুণ হলো, পরিষ্কার অবস্থায় এর ওজন অসীম, কিন্তু সামান্য ধূলা-বালি লাগলেই এটা পালকের মত হালকা হয়ে যায়। ওয়াণ্ডার স্টোনের এই গুণের ব্যাখ্যা এই যে, সুনাম অমূল্য, কোন কিছুরই ওজন তার সমান নয়। আর যার সুনাম নেই বা তার সুনামে সামান্য কলঙ্ক লেগেছে তার কোন ওজনই নেই বা গুরুত্ব নেই। এই গল্পে গঙ্গার স্বর্গ থেকে মর্ত্যে অবতরণের হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীর ছায়া দেখা যায়।

গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিস আলেকজাণ্ডার সম্পর্কে আর একটি সুন্দর গল্প আমাদের উপহার দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—দন্দমিস নামে একজন হিন্দু সন্ন্যাসী সেই সময়ে খুব নাম করেছিলেন। আলেকজাণ্ডার তাঁর ধর্মমত জানার জন্য একজন পার্শ্বচরকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর কাছে। সে দন্দমিসের আশ্রমে গিয়ে তাঁকে বলেছিল—হে ব্রাহ্মণ-কুলের শিক্ষক, আপনার কল্যাণ হউক! দেবাদিদেব মহান জিয়ুৎষর পুত্র সমগ্র মানব-জাতির প্রভু, সম্রাট আলেকজাণ্ডার আপনাকে আহ্বান করিয়াছেন। আপনি তাঁহার নিকট গমন করুন এবং প্রচুর মহার্ঘ্য উপঢৌকন প্রাপ্ত হউন। ইহার অন্যথা করিলে তিনি আপনার শিরশ্ছেদন করিবেন।'

দন্দমিস সে সময়ে পর্ণ-শয্যায় শুয়েছিলেন। গ্রীক রাজদূতের কথা শুনে তাঁর মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল। তিনি শায়িত অবস্থাতেই উত্তর দিলেন—মানব জাতির মহান অধিশ্বর পরমেশ্বর কখনো স্পর্ধিত অন্যায়ের সৃষ্টি করেন না। তিনি আলোক, শান্তি, প্রাণবারি, মানবদেহ ও আত্মার সৃষ্টিকর্তা। একমাত্র তিনিই আমার প্রভু ও দেবতা। তিনি নরহত্যা ঘৃণা করেন এবং কখনো যুদ্ধের জন্য কাহাকেও উত্তেজিত করেন না। আলেকজাণ্ডার ঈশ্বর নহেন। যিনি এখনো নিজেকে সমগ্র পৃথিবীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই, তিনি কেমন করিয়া নিজেকে প্রভু বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন? আলেকজাণ্ডার যাহা কিছু আমাকে দিতে চাহিয়াছেন এবং যে সকল উপঢৌকনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন সে সমুদয়ই আমার নিকট তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর। এই বৃক্ষ আমার গৃহ, পত্রগুলি আমার শয্যা, পুষ্প-পল্লব শোভিত উদ্ভিজ্জ আমার উপাদেয় আহার, নদীর জল আমার পানীয়। আমার পক্ষে এ সমুদয়ই মূল্যবান, মনোরম এবং একান্ত অপরিহার্য। মাতা যেমন সন্তানকে স্তন্যদান করেন, পৃথিবী তেমন আমার

সফল প্রয়োজন মিটাইতেছেন। আমি কোন কিছুর জন্য উদ্বিগ্ন নহি এবং কাহারো অধীন নহি। সেকেন্দার আমার শিরশ্ছেদন করিতে পারেন, কিন্তু আমার আত্মাকে বিনাশ করিতে পারেন না। ...যাহারা স্বর্ণ, রৌপ্য ও ধনৈশ্বর্যের জন্য লালায়িত এবং মৃত্যুর ভয়ে ভীত, সেকেন্দার তাহাদের ভীতি প্রদর্শন করুন। আমার বিরুদ্ধে এই দুটি অস্ত্রই ব্যর্থ! ...অতএব দূত, তুমি সেকেন্দারকে গিয়া বল যে, আপনার কোন বস্তুতেই দন্দমিসের প্রয়োজন নাই; সুতরাং তিনি আপনার নিকট আসিবেন না। কিন্তু আপনার যদি দন্দমিসের নিকট কোন প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে আপনি তাঁহার নিকট গমন করুন।

—হে ব্রাহ্মণকুলের শিক্ষক, আপনার কল্যাণ হউক!

[পৃষ্ঠা ৮৮২]

দূতের মুখে এই কথা শুনে আলেকজাণ্ডার প্রথমে খুবই বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। কোথায় তিনি দিগ্বিজয়ী সম্রাট, তাঁর অঙ্গুলি হেলন মাত্রে কত শত বীরের মস্তিষ্ক ধূলি চুম্বন করে, রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে, ক্রন্দনের রোল ওঠে দিক্ দিগন্তে; আর দন্দমিস কোথাকার এক ভিখারী! কিন্তু আলেকজাণ্ডারের মনে এই ক্রোধ ও বিরক্তি বেশী সময় স্থায়ী হয় নি! কারণ তিনি বুঝেছিলেন—এ এক বিচিত্র দেশ। স্বর্ণ সম্পদ ও ধনৈশ্বর্যের জন্য এদেশ বিখ্যাত; কিন্তু এদেশের আসল সম্পদ এই মানুষ, দন্দমিসের মত স্বার্থত্যাগী সন্ন্যাসীরা যে মানুষদের জীবনের আদর্শ ও শিক্ষক। আলেকজাণ্ডার দন্দমিসকে দেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

এইভাবে একমাত্র এই নগ্নদেহ বৃদ্ধ তাপস আপন আত্মিক বলে বহুজাতির বিজেতা অমিতপরাক্রমশালী আলেকজাণ্ডারকে পরাজিত করেছিলেন এবং যাঁকে সম্মান দেখিয়ে আলেকজাণ্ডারও নিজেকে ধন্য মনে করেছিলেন।

ঈশপের গল্প

গোরাচাঁদ পাল

এক গ্রামে এক চাষী ছিল। সে ছিল ভীষণ বোকা। বোকা হলে কি হবে মন ছিল তার খুব সরল। লোকে যা বলত সরলভাবে তাই বিশ্বাস করত।

এই গরীব চাষীর ছিল একটা টাট্টু ঘোড়া—তার অবস্থা যখন একটু ভাল ছিল তখন তার বউয়ের কথামত সে এই টাট্টু ঘোড়াটা কিনেছিল! চাষী বউয়ের ইচ্ছা ছিল তার ছেলে ঘোড়ায় চড়বে আর আনন্দে আমোদে দিনগুলো কাটাবে।

কিন্তু অভাব ঠিক সময় যখন এসে হাজির হল তখন চাষী তার বউকে বলল, 'দেখ এই ঘোড়াটা বিক্রী করব—আর যা টাকা পাওয়া যাবে তাতে এই অভাব খানিকটা ঘুচবে, তাই না?'

চাষী বউ ঘোড়াটাকে সত্যি খুব আদর যত্ন করতে। হঠাৎ চাষীর এইরকম কথা শুনে মনে মনে দুঃখ পেলেও একটু সহজভাবে চাষী-বউ বললে, 'বেশ তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর।'

চাষী তাই নিজের বিবেচনা মত ঘোড়াটাকে বেচবার জন্যে বাজারের দিকে চলল। সঙ্গে সে তার ছেলেকেও নিল।

বাজারে যাওয়ার পথে যেতে যেতে চাষী তার ছেলেকে বলল, 'ঘোড়াটা ভাল দামে বিক্রী হলে প্রথমে একটা বড় মাছ কিনবো কেমন—বেশ কয়েকদিন মাছ খাওয়া হয়নি।'

চাষীর ছেলে ঘাড় নেড়ে বলল, 'তাহলে বেশ ভালই হবে বাবা। মাছের মাথাটা কিন্তু আমি খাব।'

চাষী তখন আদরের সুরে বলল, 'বেশ তুই খাবি—খুশী হয়েছিস তো?'

সত্যি অভাবের তাড়নায় কোনরকমে ডাল ভাত যোগাড় করতেই চাষীর কালঘাম ছুটে যায়। ফসল যা ফলেছিল এ বছর, তা খাওয়ার জন্যে কিছু রেখে সে ইতিমধ্যে সবই বেচে ফেলেছিল। তাই মাছ খাওয়ার চিন্তাতে বাপবেটে খুব খুশী হল।

যাই হোক মনে বেশ আশা নিয়ে ঘোড়াটা বেচবার জন্যে চাষী আর তার ছেলে রাস্তা দিয়ে চলছিল। সেই সময় কয়েকজন লোক সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের দেখে সেই লোকগুলো নিজেদের মধ্যে বলতে লাগল, "এদের মত বোকা কখনো দেখেছো—অনায়াসে ঘোড়ায় চড়ে যেতে পারে, তা না নিজেরা হেঁটে ঘোড়াটার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।'

ছেলের সঙ্গে চাষী ঘোড়ায় চড়ে বসল। [পৃষ্ঠা ৮৮৮

চাষী তাদের কথা শুনতে পেল, তারপর ভাবল, 'তাইতো, আমি বড্ড বোকা, ঘোড়াটার পিঠের উপর ছেলেটাকে চাপিয়ে নিয়ে গেলেই হয়।'

– এই ভেবে চাষী তার ছেলেকে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে নিজে তাদের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে চলতে লাগল।

তারপর তারা কিছুদূর যাওয়ার পর কয়েকজন বুড়ো লোকের সঙ্গে তাদের দেখা হল। চাষীকে হেঁটে যেতে আর তার ছেলেকে ঘোড়ার পিঠে বসে যেতে দেখে একজন বলল, 'আমি যা বলছিলাম তা সচক্ষে দেখ তোমরা। একালে বুড়ো লোকের সম্মান নেই বললেই চলে। ঐ দেখ ছেলে ঘোড়ায় চড়ে কেমন দিব্যি চলেছে আর তার বাপ বুড়ো চাষী হেঁটে সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।'

অন্য একজন বুড়ো তৎক্ষণাৎ বললে, 'ওরে বোকা ছেলে। তোর বুড়ো বাপ হেঁটে যাচ্ছে আর তুই ঘোড়ায় চড়ে আরামে চলেছিস? তোর কি কোন বিবেচনা নেই।'

চাষীর ছেলে খুবই লজ্জায় পড়ে গেল। সে নিজে ঘোড়া থেকে নেমে বাবাকে ঘোড়ায় চড়িয়ে হেঁটে হেঁটে যেতে লাগল।

খানিকদূর যাওয়ার পর কয়েকজন স্ত্রীলোক তাদের দেখে বেশ অসন্তুষ্ট হল। তাদের নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, 'মিন্সের কেমন আক্কেল দেখ। নিজে ঘোড়ায় চেপে আর ছেলেকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে।' স্ত্রীলোকদের কথাবার্তা চাষীর কানে গেল

এবং খানিকক্ষণ চিন্তা করে ছেলের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে বসল। দু'জন একসঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে চলতে চলতে চাষী ভাবল, 'এবার আর কেউ কিছু বলতে পারবে না।'

কিন্তু চাষী ভাবলে কি হবে, তার কপাল নেহাত মন্দ ছিল তাই পাড়ার মোড়লের সঙ্গে পথে দেখা হয়ে গেল। বাপ বেটা একসঙ্গে একই ঘোড়ার পিঠে চড়ে যেতে দেখে মোড়ল ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন, বললেন, 'ওহে! তোমাদের এভাবে ঘোড়ায় চড়তে দেখে ঘোড়াটা তোমার বলে মনে হচ্ছে না—তোমার যদি হত তাহলে এত নিষ্ঠুর হতে না। কোন্ বিবেচনায় এমন ঘোড়াটার ওপর দুজন এক সঙ্গে চেপেছো—নির্দীহ জীব পেয়ে এত কষ্ট দিচ্ছো—এর পর যে ঘোড়াটাকে কাঁধে করে নিয়ে যেতে হবে।'

পাড়ার মোড়লের তিরস্কার শুনে চাষী ও চাষীর ছেলে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। আর অন্য কিছু চিন্তা না করে তারা দড়ি দিয়ে ঘোড়ার পা বাঁধল এবং পায়ের ভেতর বাঁশ লাগিয়ে দিয়ে কাঁধে করে নিয়ে চলল।

এইভাবে একটা জীবন্ত ঘোড়াকে নিয়ে যেতে দেখলে স্বভাবতই সকলকার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাজারের কাছ বরাবর একটা খাল ছিল। তারা ঐ খালের পুলের উপর উঠলে একদল ছেলে চাষী আর তার ছেলেকে জীবন্ত ঘোড়া এই ভাবে কাঁধে করে নিয়ে যেতে দেখে খুব আনন্দ অনুভব করল।

তাদের ভেতর একজন বললে, 'দেখ দেখ কি বোকা লোক দুটো? জ্যান্ত ঘোড়াটাকে কাঁধে নিয়ে চলেছে।'

তার কথায় অন্যান্য ছেলেরা হো হো করে হাসতে লাগল, নিজেদের মধ্যে হাততালি দিয়ে খুব হৈ হুল্লোড় করতে আরম্ভ করল।

ঘোড়াটা এতক্ষণ চুপ করেই ছিল। ছেলেদের চেঁচামেচিতে ভয় পেয়ে ঘোড়া সজোরে পায়ের দড়ি ছিঁড়ে ফেলল এবং পুল থেকে খালের জলে পড়ে গেল।

চাষী আর চাষীর ছেলে হতভম্ব হয়ে গেল। একটু পরে যখন ব্যাপারটা বুঝল তখন তারা দেখল খালের জলে ঘোড়াটা পড়ে গিয়ে ডুবে যাচ্ছে। করুণভাবে চাষী ঘোড়ার মৃত্যু দেখল আর ভাবল, 'তাই তো সকলকে খুশী করতে গিয়ে কাউকে খুশী করতে পারলাম না, লাভের মধ্যে আমার ঘোড়াটা মারা পড়ল।'

চোখের সামনে ঘোড়াটার এ রকম দশা দেখে চাষীর ছেলে হঠাৎ বোকার মত বলে ফেলল, 'বাবা! তাহলে ঘোড়া বিক্রী করা হল না আর আমার মাছের মাথা খাওয়াও হল না।'

বুড়ো চাষী ছেলের নির্বোধের মত কথায় একটুও রাগ করল না। সে ঘোড়ার শোকে বিভোর ছিল তখন, তাই তার মুখ দিয়ে আবার বেরিয়ে এল, 'ওরে সকলকে খুশী করতে গেলে নিজেরই মন্দ হয়।'

আচ্ছা এই যে গল্পটা শুনলে এটা হচ্ছে ঈশপের গল্প। এ রকম ধরনের ঈশপের নীতিগল্প অনেক আছে। তোমাদের অনেকের পড়ার বইয়ে ঈশপের গল্প সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া আছে। তোমার দাদা দিদিরা কেউ কেউ Aesop's fables পড়ে থাকবে। আচ্ছা তোমরা নিশ্চয় বিদ্যাসাগর মশায়ের 'কথামালা' বইয়ের নাম শুনেছো বা দাদা দিদিদের কাছে 'কথামালার' গল্পও শুনে থাকবে এই 'কথামালা' গল্পগুলো সব ঈশপের রচনা। বিদ্যাসাগর মশাই তোমাদের উপযোগী করে বাংলাভাষায় লিখেছিলেন।

ঈশপের গল্প শুনে তোমরা অনেক কিছু শিখতে পার—উপদেশও পাও; কিন্তু যিনি এত নীতিগল্প সারা পৃথিবীর জনগণকে উপহার দিয়েছেন তাঁর সম্বন্ধে কিছু শুনতে নিশ্চয় ইচ্ছ করে। তিনি কে ছিলেন, কী করতেন, কীভাবে তাঁর জীবন চলত, কি উপায়ে এই মূল্যবান গল্পগুলো রচনা করতেন তা তোমাদের জানবার ইচ্ছা, নয় কি?

ঈশপ সম্বন্ধে একটা কথা বললে অবাক্ হবে যে তিনি ছিলেন একেবারে নিরক্ষর। অর্থাৎ তিনি লেখাপড়া কিছুই জানতেন না। আর এই নিরক্ষর কুৎসিত কদাকার অতি বিশ্রী বেঁটে মানুষটি ছিলেন গ্রীসদেশের এক ধনী লোকের ক্রীতদাস।

তোমরা ভাবছো এই বিকলাঙ্গ ছোটখাটো মানুষটি যিনি লেখাপড়া কিছুই জানতেন না, তিনি কি করে এত সুন্দর সুন্দর নীতিগল্প রচনা করতেন, তাই না? তিনি গল্প লিখতেন না, মুখে মুখে গল্প তৈরি করতে পারতেন। আর লোকের মুখে মুখে তাঁর গল্প ছড়িয়ে পড়ত গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে এমনি করে গোটা পৃথিবীটায়।

তাঁর অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রতিটি নীতিগল্পে দেখা যায়। যেখানে অন্যায়, যেখানে দুর্নীতি, যা ভাল নয়, যা দেশ ও দশকে অমঙ্গল করবে তার বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়াতে ভয় পেতেন না।

খ্রীষ্টপূর্ব ৬২০ থেকে ৫৬০ শতকের নির্ভীক মানুষ ঈশপ গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে তখনকার লিডিয়ার রাজা ক্রোয়েসাসকে মুগ্ধ করেছিলেন। তাই তিনি ক্রীতদাস থেকে মুক্ত হয়ে তিনি ক্রোয়েসাসের রাজধানীতে বসবাস করতে সুযোগ পেয়েছিলেন।

এর পর রাজা ক্রোয়েসাস ঈশপকে ডেলফিনগরের অ্যাপলো মন্দিরে থাকবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। তাঁর অনুরোধ ঈশপ রেখেছিলেন। কিন্তু নির্ভীক সাহসী,

টীকাটিপ্পনী দিয়ে ডেলফিয়ানদের ভাল পথ ধরবার জন্যে ইঙ্গিত করলেন।

অটল ঈশপ ডেলফিয়ানদের দেখলেন, বুঝলেন এবং সেইভাবে তাঁর মত প্রকাশ করলেন। তিনি টীকাটিপ্পনী দিয়ে ডেলফিয়ানদের ভাল পথ ধরবার জন্যে ইঙ্গিত করলেন। কিন্তু ফল ফলল উলটো। ডেলফিয়ানরা খেপে গেল এবং একদিন তারা পাহাড়ের উঁপর থেকে ঈশপকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মেরে ফেলল। এমনিভাবে অন্যায়কে ন্যায়ের পথে আনতে গিয়ে তাঁকে কী মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করতে হলো।

ঈশপ মারা গেলেন কিন্তু তাঁর গল্প তো মরে গেল। প্রায় দুশো বছর পর একজন এথেন্সবাসী ঈশপের গল্পগুলো লিখে ফেললেন। তারপর ব্যাবিয়াস বলে একজন গ্রীক এই গল্পগুলো আরও ভালভাবে লিখে বইয়ের মত করে সাজালেন। কিন্তু হাজার হাজার বছর এই গল্পগুলো মানুষের কাছে অজ্ঞাত ছিল।

তারপর অনেকদিন পর ১৮৪৪ সালে গ্রীসের এথস পাহাড়ের একটা মঠের মধ্যে ব্যাবিয়াস যে বইটি লিখেছিলেন তার পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। আজ যে ঈশপের গল্প পড়ে বা শুনে আনন্দ পাচ্ছো তা এই ব্যাবিয়াসের পাণ্ডুলিপিরই অনুবাদ।

গাছে ঝুলন্ত আঙ্গুর ফল না পেয়ে ব্যর্থ শৃগাল আঙ্গুর ফল টক বলে চলে গেল বটে কিন্তু ঈশপ শৃগালের মুখ দিয়ে যে পথ চলার ইঙ্গিত দিলেন তা কি ভোলবার?

বুড়ো বাঘের গলায় কাঁটা বার করে দেওয়ার পর বক পুরস্কার চাইলে বাঘ বলেছিল,

যে পুরস্কার সে কি করে আশা করে? তার মত হিংস্র বাঘের মুখের ভেতর থেকে তার ঠোঁটটা বার করে নিতে পেরেছিল—এটা কি তার পুরস্কার নয়?

ঈশপ বাঘ আর বকের গল্পেও কত বড় একটা সুন্দর সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, তাও কি ভোলবার? তাই বলছিলাম বাঘ ও বকের গল্পের স্রষ্টা ঈশপ হাজার হাজার বছর আগে মরে গেছেন কিন্তু তাঁর সুন্দর সুন্দর গল্পের ভেতর দিয়ে তিনি চিরকাল আমাদের মধ্যে আছেন, আগেও ছিলেন আর আসছে দিনেও আমাদের মধ্যে থাকবেন।

পাদুকার দ্বারা জয়লাভ *

পূরবী দেবী

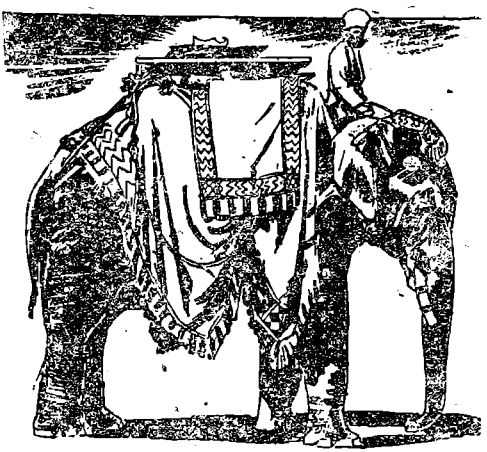

সহোদর ভাই দারাকে হত্যা করার পর আওরঙ্গজেবের রাজ্য নিষ্কণ্টক হল। এইবার আওরঙ্গজেব সাম্রাজ্য বিস্তারে মন দিলেন।

মোগল সাম্রাজ্যের আশেপাশে যে সব ছোটখাট স্বাধীন রাজ্য ছিল তাদের বশীভূত করে নিজের অধীনে আনবার জন্যে আওরঙ্গজেব নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করলেন।

কোন রকম সৈন্য-সামন্ত না পাঠিয়ে কোন রকম রক্তক্ষয়ের পথে না গিয়ে প্রতিবেশী রাজাদের মনোবল যাতে ভেঙ্গে পড়ে ও তারা নিজেরাই যাতে বশ্যতা স্বীকার করে আওরঙ্গজেব সেই পথ নিলেন।

একটা হাতীকে সুসজ্জিত করে তার পিঠে হাওদার উপর হলুদ রংয়ের চামড়ায় তৈরি নিজের একজোড়া জুতা চাপিয়ে তাকে প্রতিবেশী রাজার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। যদি রাজা সন্ধি করতে চাইতো তাহলে হাতী তার রাজ্যে প্রবেশ করা মাত্রই তাকে শুধু পায়ে এগিয়ে এসে হাতীকে অভ্যর্থনা করে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যেতে হত। প্রাসাদে পৌঁছবার পর যথাবিহিত সম্মানের সঙ্গে জুতাজোড়াটি সিংহাসনে স্থাপন করলে সেই রাজ্য সম্রাটের করদ রাজ্য বলে গণ্য করা হত। তার বিরুদ্ধে আওরঙ্গজেব আর জেহাদ ঘোষণা করতেন না।

এইভাবে রাজাদের মনোবল ক্ষুণ্ণ করে আওরঙ্গজেব ১৭টি রাজ্যের মাথায় পাদুকাঘাত করে তাদের জয় করেছিলেন।

---

* স্লিপ্পে থেকে

হাঁদা ভোঁদার

বুদ্ধি খাটানো

আর একজনের কাছে
বেশী সময় লাগবে না রে ভেটকু ! আরও একজন সেখানে গেছে।
ঠিক আছে— তুই তাহলে এদিকটায় হাত লাগা।
ওফ ওফ্‌! প্রায় শেষ কোরে এনেছি! এ তবু নোংরা মাটি বওয়ার চেয়ে ভালো।
উফস্‌! যাক, এতক্ষণে মাটি সাফ হয়ে গেছে। এতেই আনন্দ!
অ্যাক! ওঃ, ওরে বাবা, না, না। কি করে, কেমন করে এটা ঘটলো ?
হাঁদার দুজন বন্ধু এসে বলল পাঁচ টাকা পেলে তারা আমার মাটি সরিয়ে দেবে। আপনারটা কি. হলো ?
হাঁদা আমারটা বিনা পয়সাতেই সরাবে!
তোর কষ্টে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হতে চাইছে হাঁদা, কিন্তু কি করি বল ? পিসেমশাইয়ের কঠোর নির্দেশ তোকে পাহারা দেওয়ার !

ভগৎ সিং রাজগুরু

গদর পার্টি ও কোমাগাটা মারু

রঞ্জন মিত্র

আনন্দমোহন বসু ছিলেন অর্ধশতাব্দী আগেকার অখণ্ড বাংলার অন্যতম নেতা, তিনি বলতেন—লাট কার্জন ভারতবাসীর অশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র, কারণ বঙ্গভঙ্গ করে এই জাতিটাকে তিনি জাগিয়ে তুলেছেন দেড়শো বছরের সুখনিদ্রা থেকে।

বাস্তবিক ১৯০৫ সালে বাংলা দেশ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই যে উত্তেজনার দাবানল জ্বলে উঠল ভারত জুড়ে, ১৯৪৭ এর ১৫ই আগস্টের আগে কেউ তাকে নেভাতে পারে নি কোনদিন। স্বদেশী আন্দোলন, মজঃফরপুরে কেনেডি মহিলাগণের হত্যা, আলিপুর বোমার মামলা—তার পরই ভারতের বিভিন্ন অংশে নিত্য নতুন ষড়যন্ত্রের উদ্‌ঘাটন আর তারই ফলে দলে দলে ভারতীয় তরুণের ফাঁসির মঞ্চে আত্মদান বা আন্দামানের জেলখানায় তিলে তিলে জীবনক্ষয়—এদেশের ইতিহাসে সে গিয়েছে এক রক্তাক্ষরে লেখা অধ্যায়।

ভারতের বাহিরেও সে দাবানলের ফুলকি উড়ে গিয়ে ছোট খাট অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়েছে বই কি! জার্মানিতে বার্লিন কমিটি প্রতিষ্ঠিত হল, ইংল্যাণ্ডে মদনলাল ধিংড়া গুলি করে মারল কার্জন ওয়াইলিকে, মার্কিন দেশের পশ্চিম প্রান্তে অভ্যুদয় ঘটল ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের যার ইংরেজী নাম ছিল ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ।

১৯০৭ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলে শহরে কয়েকটি ভারতীয় যুবককে দেখা গেল—তারা এসেছে পড়াশুনা করবার জন্য। তারা একটা ছোট্ট সমিতি গড়ে তুলল—ভারতকে স্বাধীন করবার উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে যথাসম্ভব সাহায্য করবার মতলব নিয়ে।

ঠিক সেই সময়টাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং কানাডাতে মিলিয়ে ভারতীয় শিখের সংখ্যা ছিল অনেক,—আট হাজারের কম নয়। প্রতি বৎসরই সংখ্যাটা বেড়ে যাচ্ছে, দুই দেশেরই সরকার উদ্বেগ বোধ করতে লাগলেন তা দেখে। বসল শিখদের উপর নানা রকম ট্যাক্স কানাডায়, ঠিক যেন ঔরঙ্গজেবের আমলের জিজিয়ার মত। নানা দিক দিয়ে বৈষম্যমূলক আচরণ, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ না করে পারা যায় না।

অভিযোগের উত্তরে আরও অবিচার, শেষ পর্যন্ত এমন কতকগুলি আইন প্রণয়ন করল কানাডা সরকার, যার ফলে ভারত থেকে কারও কানাডায় আসাই অসম্ভব হয়ে উঠল। তার মধ্যে সব চেয়ে মারাত্মক আইনটি হল এই যে ভারত থেকে কানাডায় কাউকে আসতে হলে কোথাও জাহাজ বদল না করে সরাসরি আসতে হবে। অথচ কার্যতঃ এটা সম্ভবই ছিল না, কারণ ঐ দুই দেশের ভিতর তখন পর্যন্ত সরাসরি জাহাজ-চলাচলের ব্যবস্থাই হয় নি।

এদিকে সানফ্রান্সিস্কো শহরে নতুন একটি পার্টির উৎপত্তি হয়েছে প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে, তার নাম হল গদর পার্টি। 'গদর' শব্দটি গুরুমুখী ভাষা থেকে গৃহীত, এর অর্থ হল বিদ্রোহ। এ পার্টির মূল উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকা থেকে উৎসাহ যুগিয়ে এবং অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করে ভারতের অভ্যন্তরে বিদ্রোহ ঘটানো।

মূল উদ্দেশ্য অবশ্য তাই ছিল, কিন্তু ঘরের কাছে কানাডার শিখ প্রবাসীদের দুর্দশার প্রতি তারা ত উদাসীন থাকতে পারে না। ক্রমে ক্রমে স্বাধীনতা-আন্দোলন আর শিখ সমর্থনের আন্দোলন দুটো এক সাথে মিশে জড়িয়ে একাকার হয়ে গেল, একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটা সম্বন্ধে চিন্তা করাই যেন পার্টি সদস্যদের কাছে কঠিন হয়ে উঠতে লাগল।

গদর পার্টির সদস্যসংখ্যা আশাতীত রকম বেড়ে যাচ্ছে, তারা একটা সংবাদপত্র প্রকাশ করছে—তারও নাম 'গদর'। কাগজটি ছাপা হচ্ছে গুরুমুখী, গুজরাটী, হিন্দী ও উর্দুতে। এমন কি বাছাই-করা দুই চারটা প্রবন্ধ অনুবাদ করে নিয়ে একটা ইংরেজী সংস্করণও মাঝে মাঝে প্রকাশিত হচ্ছে। 'গদর' কাগজ বিদ্রোহের সুস্পষ্ট নির্দেশ নিয়ে ভারতেও আসতে আরম্ভ করল।

আর নিশ্চিন্ত থাকা সমীচীন মনে করল না ভারতবর্ষীয় ইংরেজ সরকার। শিখেরা হল দুর্ধর্ষ সামরিক জাতি, তাদের ভিতর অসন্তোষ দানা বাঁধতে দিলে পরিণামে বিপদ ঘটতে পারে। ব্যাধি ঠিকই নির্ণয় করেছিল ইংরেজেরা, কিন্তু তার চিকিৎসা শুরু করল ভুল পথে। অসন্তোষের কারণ দূর করবার চেষ্টা না করে অসন্তুষ্টদের গলা টিপে ধরল—যাতে তারা চেঁচিয়ে পৃথিবীর মানুষকে নিজেদের নালিশ না শোনাতে পারে।

কানাডা ত ইংরেজদেরই উপনিবেশ, মার্কিন দেশও ইংলণ্ডের সঙ্গে মৈত্রী-সূত্রে আবদ্ধ। কাজেই তাদের সঙ্গে একটা বোঝাপাড়ায় উপনীত হওয়া শক্ত হল না ভারত সরকারের পক্ষে। ভারত সরকারের এজেন্ট নিযুক্ত হল হপকিন্‌সন নামে একটা ইংরেজ সামরিক কর্মচারী, তার সহকারী হল বেলা সিং নামক একটা বেইমান শিখ। তারা আমেরিকায় বসে গদর পার্টির নেতাদের নামে রাজদ্রোহ এবং রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনতে লাগল মার্কিন আদালতে। নেতারা কেউ জার্মানিতে পালিয়ে বাঁচলেন, যথা হরদয়াল। কেউ বা নিহত হলেন আততায়ীর গুলিতে, যথা পণ্ডিত রামচন্দ্র।

অবশেষে হপকিন্‌সনও অপসারিত হল সেরা সিং নামক গদর পার্টির এক নির্ভীক তরুণের অস্ত্রাঘাতে। কিন্তু পার্টির উপর অত্যাচার তাতে একটুও কমল না।

এদিকে, শিখেরা যাতে সরাসরি ভারত থেকে আমেরিকায় পৌঁছোতে পারে, তারই ব্যবস্থা করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছেন সিঙ্গাপুরের শিখ ব্যবসায়ী গুরদিৎ সিং। তিনি চারখানা জাপানী জাহাজ কিনে ফেললেন। দুখানা কলকাতা আর কানাডার মধ্যে চলাচল করবে, আর দুখানা মাদ্রাজ আর ব্রাজিলের মধ্যে। প্রথম জাহাজ "কোমাগাটা মারু" হংকং থেকেই ছাড়ল কানাডা অভিমুখে—সাংহাই, ইয়োকোহামা, কোবে প্রভৃতি বন্দর থেকে দলে দলে শিখযাত্রীকে তুলে নিয়ে। মোট যাত্রী দাঁড়াল ৩৭২ জন।

১৯১৪ সালের ২৩শে মে তারিখে ভ্যাংকুবার বন্দরের কাছাকাছি পৌঁছোলো কোমাগাটা মারু। উপকূল তখনও পুরো পাঁচ মাইল দূরে রয়েছে, এমন সময় দুখানা ইংরেজ যুদ্ধজাহাজ এসে দুদিক থেকে গতিরোধ করল তার। বন্দরে ভিড়তে দেবে না তারা কোমাগাটা মারুকে। সেইখান থেকেই ভারতে ফিরে যেতে হবে জাহাজের।

যাত্রীরাও ফিরবে না। কানাডা সরকারও কোমাগাটাকে বন্দরে ভিড়তে দেবে না। দীর্ঘ দুই মাস ধরে চলল অনুনয়-বিনয় যাগারাগি রেষারেষি। এদিকে জাহাজের খাবার ফুরিয়ে গেল, এক বিন্দু পানীয় জল কোথাও নেই। জাপানী নাবিকেরা কূলে উঠবার অনুমতি পেয়েছিল, তারা স্বাধীন দেশের নাগরিক বলেই। তারাই এক এক বালতি জল কূল থেকে নিয়ে আসত, আর যাত্রীদের কাছে বিক্রি করত প্রতি বালতি এক ডলার দামে।

অবশেষে একদিন যুদ্ধজাহাজ 'রেইন-বো' থেকে এক সামরিক কর্মচারী হেঁকে বললেন—"আমি কোমাগাটা মারুকে পনেরো মিনিট সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে জাহাজ খুলে ভারতের অভিমুখে যাত্রা না করলে রেইন-বো'র নৌসেনা কোমাগাটাতে উঠবে এবং তোকে চালিয়ে নিয়ে যাব কলকাতার দিকে।"

সামরিক কর্মচারীটি ঘড়ি ধরে দাঁড়ালেন রেইন-বো'র রেলিং ঘেঁষে। নৌসেনা তৈরী হয়ে দাঁড়াল কোমাগাটাতে লাফিয়ে উঠবার জন্য। যাত্রীরা উভয় সংকটে পড়ল। সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ অস্ত্র বলতে ত তাদের হাতে কিছুই নেই। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় অকূল সমুদ্রে বেরিয়ে পড়াও ত আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছু নয়, এই ৩৭২ জন যাত্রীর পক্ষে। অনাহারেই ত তারা মারা পড়বে দুদিনের ভিতর।

হঠাৎ যাত্রীদের ভিতর কারও কারও দৃষ্টি পড়ল শহরের দিকে। পাহাড়ের গায়ে শহর, সেই পাহাড় থেকে কোন বন্ধু সিমাফোর সংকেতের সাহায্যে খবর পাঠাচ্ছে তাদের কাছে। সংকেত বলছে—"যেও না তোমরা কিছুতেই। নৌসেনা তোমাদের জাহাজে উঠলেই আমরা ভ্যাংকুলার শহর জ্বালিয়ে দেব। এই কথা বলে দাও রেইন-বো'কে।"

কোমাগাটার উপর সে কী প্রচণ্ড জয়ধ্বনি তখন।

রেইন-বো'র কর্মচারীও সে সংকেত দেখেছে। সে নরম করে ফেলল নিজের সুর। একটা মীমাংসা হলো। কোমাগাটা ফিরে যাবে বটে, কিন্তু তার আগে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য পানীয় জাহাজে তুলে নেবার সুযোগ তাদের পাওয়া চাই। সামরিক কর্মচারী রাজী হয়ে গেল তাতে।

অতঃপর ভারতের পথে ফিরতে বাধ্য হল কোমাগাটা মারু। ভারত সরকার এমনি কলকাঠি নেড়ে দিয়েছিল যে জাপানের কোন বন্দরে ভিড়তে পারল না জাহাজ। হংকং, সাংহাই, সিঙ্গাপুরেও নয়। একেবারে এসে বজবজে থামল অভাগা যাত্রীরা।

এইখানে কোমাগাটার গতিরোধ করল পুলিস। নামতে বাধ্য করল যাত্রীদের, বলল—"রেলগাড়ি তৈরী আছে, তোমরা সোজা চলে চাও পাঞ্জাবে। তোমরা ত শিখ। সেই ত তোমাদের নিজের জায়গা!"

যাত্রীদের কোন অনুনয়, কোন প্রতিবাদ কানে তুলল না পুলিস। কিন্তু যাত্রীরা পাঞ্জাবে গিয়ে করবে কী? তারা ত পাঞ্জাবের বাস তুলে দিয়েছে বহু কাল আগে! কেউ সিঙ্গাপুরে, কেউ সাংহাইয়ে রুজিরোজগার করে দিন চালাচ্ছিল। কানাডা যেতে চেয়েছিল বেশী উপার্জনের আশায়। সেখানে ত যাওয়া হলই না, আগের কর্মস্থানেও জাহাজ থেকে নামবার সুযোগ পেল না। এখন অন্ততঃ কলকাতা যেতে পারলেও তারা আবার হয়ত কোন ক্রমে একটা জীবিকার সংস্থান করতে পারবে। পাঞ্জাবে অন্ন কোথায়?

অগত্যা সেই তিনশো লোক পায়ে হেঁটে রওনা হল কলকাতার দিকে। পুলিস তাদের রুখতে পারল না।

কিন্তু পায়ে হেঁটে সামান্য দূর যেতে-না-যেতেই কলকাতা থেকে মোটরে চড়ে একদল

লোক এসে দাঁড়াল তাদের সমুখে। তাদের মধ্যে কিছু পুলিস, বাকী কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। একজন বলল—"আমি গবর্নরের প্রতিনিধি। তোমরা বজবজে ফিরে চল। সেখানে তোমাদের অভিযোগ সব শুনব, তোমরা যে যেখানে যেতে চাও, পাঠিয়ে দেব সেইখানে।"

আশ্বাস পেয়ে শ্রান্ত জনতা আবার বজবজ ফিরে এল পায়ে পায়ে। মোটরে চড়ে গবর্নরের প্রতিনিধিও এল। সেই স্টেশন! সেই রেলগাড়ি তখনও তৈরী। উপরন্তু তিন ব্যাটালিয়ন সশস্ত্র সৈন্য সেখানে মোতায়েন। এরা কখন কোন্ পথে কোথা থেকে এসে পড়েছে, যাত্রীরা কিছু টের পায় নি।

"গাড়িতে চড়"—হুকুম সেই সেনাদলের।

তখন যা শুরু হল, সে এক নারকীয় কাণ্ড। লাথির উপর লাথি বৃষ্টি হতে লাগল যাত্রীদের অঙ্গে। কেউ যদি বাধা দিতে গেল, তখন আর লাথি নয়, বেয়নেটের খোঁচা। সরকারী হিসাবেই ষোল জন মারা গিয়েছিল সেইখানে। বেসরকারী হিসাব চুয়াল্লিশ জন।

শেষ পর্যন্ত সমস্ত যাত্রী ট্রেন বোঝাই হয়ে রওনা হল সুদূর পাঞ্জাবের পানে। ওদের আদিস্থান বটে সেটা, কিন্তু আজ সেখানে তাদের না আছে গৃহ, না আছে জীবন-ধারণের কোন উপায়।

কোমাগাটা মারুর যাত্রীদের উপর এই নৃশংস অত্যাচার ভারতে ইংরেজ শাসনের কলঙ্কিত ইতিহাসের অন্যতম মসীলিপ্ত অধ্যায়। সারা ভারতে উত্তেজনার রক্তশিখা জ্বলে উঠল এই ঘটনায়। সুদূর আমেরিকায় বসে গদর পার্টি যখন শুনল এ কাহিনী, তখন তারা নতুন করে শপথ নিল—ভারতের মাটি থেকে ইংরেজকে ঝাড়ে বংশে উপড়ে ফেলবার জন্য।

আর ভারত থেকে আমেরিকায় যাওয়া নয়। এবার আমেরিকা থেকে ভারতে ফেরা, ভারতের মাটিতে স্বাধীনতার যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য। দলবদ্ধ হয়ে নয়, দুইজন চারজন করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিপ্লবীরা ভারতে ফিরতে লাগল গোপন পথে। প্রস্তুত হয়ে থাকল চরম বোঝাপড়ার দিনের জন্য।

তারই পরিণতি, পাঞ্জাবব্যাপী সহিংস অভিযান ভগৎ সিং রাজগুরুর নেতৃত্বে। রক্তবন্যা, ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান—স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার যজ্ঞবেদীমূলে শত-শহীদের আত্মোৎসর্গ। ব্যর্থ হয়নি সে আত্মোৎসর্গ। স্বাধীন ভারত আজ সগৌরবে স্মরণ করে গদর পার্টির দেশপ্রেমের অবিস্মরণীয় কাহিনী।

———

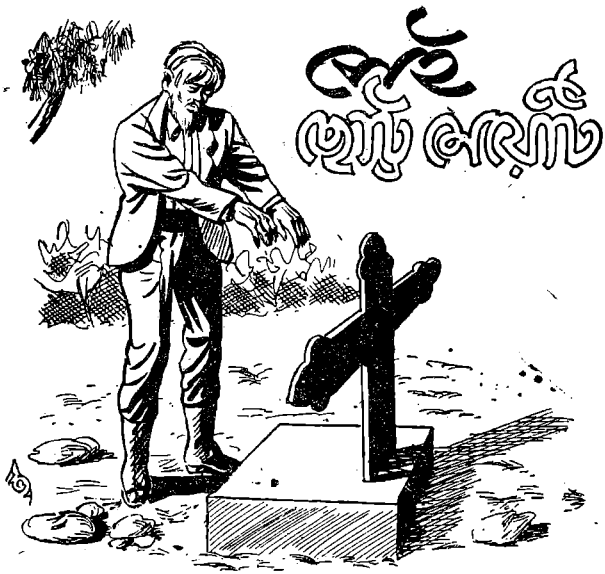

নির্মলেন্দু গৌতম

দীর্ঘকালের পুরোনো এই কবরখানা। এখানকার পুরোনো এবং একমাত্র পাহারাঅলা হলো যোসেফ। বয়সের ভারে নুয়ে পড়া তার চেহারা কবরখানার সঙ্গে সত্যি সত্যি আশ্চর্যভাবে মানিয়ে যায়।

যোসেফের বয়স যে কতো, কেউ তা সঠিক বলতে পারে না। আশেপাশের লোকেরা বলে, 'যোসেফ? ওকে তো আমরা আমাদের জন্ম থেকে দেখছি। বোধহয় আমাদের ঠাকুরদাও ওকে জন্ম থেকে দেখেছে। ওর বয়স একশোও হতে পারে পাঁচশোও হতে পারে।'

যোসেফ বলে, 'কি জানি বাপু, আমার বয়স কতো। কেউ তো কোনো দিন আমার কুষ্ঠী ঠিকুজি করে রাখেনি। রাখলে না হয় বলতে পারতুম।'

এখন আর কেউ অবশ্য যোসেফের বয়স নিয়ে মাথা ঘামায় না।

অসম্ভব কম কথা বলে যোসেফ। যখন কথা বলে, তখন এই কবরখানার কথা ছাড়া আর কোনো কথাই বলে না সে।

জানা থাকবে কি করে? এখানে কতো ঘটনা রোজ ঘটে যাচ্ছে তার চোখের সামনে। সেসব ঘটনা দেখতে দেখতে আর শুনতে শুনতেই তার দিন ফুরোয়, রাত ফুরোয়।

রোজ সকালবেলা কিন্তু যোসেফের একটি কাজ আছে। ছোট্ট একটি কবরের ওপর একটি করে ফুল সে দেবেই। তারপর সে শুরু করবে তার সারা দিনের কাজ।

সেই কবরের মধ্যে শুয়ে আছে ছোট্ট একটি মেয়ে। যোসেফ জানে মেয়েটি সেই ফুলের গন্ধ নিয়েই কবরের মধ্যে শুয়ে সারাটা দিন কাটায়।

অবশ্য যোসেফের এটা জানবার পেছনে কারণও আছে। মেয়েটি নিজেই যে একদিন কথাটা বলেছিল তাকে।

ঘটনাটা ভাবলে যোসেফ এখনও যেন কেমন হয়ে যায়।

কলকাতায় তখন বোমার ভয়ে ব্ল্যাক আউট চলেছে। সন্ধ্যে হলেই অন্ধকারে ডুবে যায় চারদিক। রাস্তায় লোকজন বেশী চলে না। হেডলাইটগুলো কালোয় ঢেকে ছুটোছুটি করে বাস ট্রাম।

কবরের এদিকটাতে গাড়ি ঘোড়া এমনিতেই কম চলে। ব্ল্যাক আউটের জন্য তা একেবারেই কমে গেছে।

এমনি এক অন্ধকার রাত্রি শেষ হওয়া সকালে একটা কফিনে করে ছোট্ট একটি মেয়েকে নিয়ে এলেন এক ভদ্রলোক। সঙ্গে মেয়েটির মা আর কয়েকজন আত্মীয়।

মেয়েটির মায়ের নিঃশব্দ কান্নায় যেন যোসেফের সমস্ত শরীর কেমন অসাড় হয়ে যেতে থাকল। এখানে অনেক মায়ের কান্না শুনেছে যোসেফ। কিন্তু মেয়েটির মায়ের কান্না এমন নিঃশব্দ যে তা যোসেফ সহ্যই করতে পারছে না। একটু সরে যেতে চাইল যোসেফ। কিন্তু কি এক আকর্ষণে তা-ও পারল না।

সমস্ত ক্রিয়া তাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হল।

সমস্ত কাজকর্ম সেরে ওদের যাবার পর অবশ শরীরে যোসেফ সেই যে বসে পড়ল সেখানে উঠল সূর্য ওঠবার পর। উঠেই কি মনে হল, কবরখানার ভেতরের একটা ফুলগাছ থেকে একটা ফুল তুলে ছোট্ট মেয়েটির কবরের ওপর রেখে ভগবানের নাম করল। তারপর নিঃশব্দে এল নিজের কাজে।

এমনি ভাবে বেশ কিছুদিন মেয়েটির কবরের ওপর নিয়মিত সকালে ফুল দিতো যোসেফ। কেউ জানতো না। কি করে জানবে? যোসেফ তো কাউকে বলেনি।

মাঝে মাঝে মেয়েটির বাবা আসত। বসে থাকত কিছুক্ষণ। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিঃশব্দে চলে যেত।

সেদিন অনেক রাতে ছোটো আলোটা জ্বালিয়ে ঝিমুচ্ছিল যোসেফ।

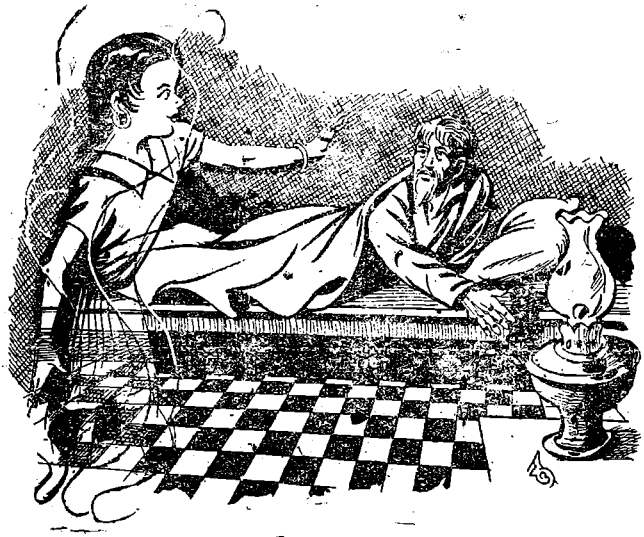

"আমায় চিনতে পারছ না?"

হঠাৎ যেন শুনতে পেল, খুব নীচু গলায় কে যেন ডাকছে তাকে। অদ্ভুত নরম তার গলার স্বর। কিন্তু তবু আরামের ঝিমুনি কাটিয়ে চোখ মেলতে পারছে না যোসেফ।

হঠাৎ একটা অসম্ভব ঠাণ্ডা স্পর্শ অনুভব করল হাতের ওপর। চমকে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। চোখ মেলেই অবাক্। একটা ছোট্ট মেয়ে ডাকছে তাকে।

কিন্তু মেয়েটি এতো রাতে এখানে এলো কি করে? হাতখানাই বা এমনি ঠাণ্ডা কেন?

চোখ কচলাল। ফের দেখল। মেয়েটা যেন ছায়ার মতো অথচ ছায়া নয়। সে যেন সবাইকে ছুঁতে পারে, কিন্তু তাকে কেউ ছুঁতে পারে না। পালকের মতো হালকা তার শরীর। যেন ভাসছে বাইরের মৃদু বাতাসে।

'আমায় চিনতে পারছ না?' মেয়েটি অদ্ভুত গলায় শুধাল।

যোসেফ মন্ত্রমুগ্ধের মতো বলল, 'উহুঁ।'

'আমার কবরের ওপর তুমিই তো রোজ একটা করে ফুল দিতে। তখন সারাটা দিন আমার ফুলের গন্ধে কেটে যেতো। এখন আর কেন দাও না বলো ত?'

এবার যোসেফ চিনতে পারল মেয়েটিকে। সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন হয়ে গেল যোসেফ্। এতো কাল এই কবরখানায় আছে, এমনি ঘটনা কোনোদিনই ঘটে নি। না, ভয় নয়, কেমন এক দুঃখ যেন ঢেকে ফেলল যোসেফকে। যোসেফের এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে ছোট্ট মেয়েটিকে এমনিভাবে দেখলে বোধ হয় সব চাইতে ভীরু লোকও ভয় পাবে না। এসব কথা ভেবেই মৃদুস্বরে যোসেফ বলল, 'কাল থেকে আবার দেব।'

'মাও, এবার ওঠো, আমার সঙ্গে একটু যাবে। আজ আমার বাবা মার জন্য মন কেমন করছে। দেখে আসব একবার।'

'আমি যে তোমাদের বাড়ি চিনি না—' অসহায়ভাবে বলল যোসেফ।

'আমি চিনি। কফিনে করে যখন এসেছি এখানে, তখনি ভেতর থেকে দেখে নিয়েছি সব।'

দারুণ আগ্রহ ফুটে উঠল মেয়েটির মুখে।

'ও। তাহলে—তাহলে চল—' বলে যোসেফ উঠল।

কিন্তু মেয়েটিকে তার বাবা মার কাছে নিয়ে গিয়ে কি বলবে? ঘেমে উঠল যোসেফ। মেয়েটি কি সত্যি সত্যি তার বাবা মার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে? কি হবে দাঁড়ালে?

'কি হল, চল!' মেয়েটি তার জামার একটা কোনা ধরল। সত্যি, কি ঠাণ্ডা তার হাত। শরীরের ভেতর পর্যন্ত সেই ঠাণ্ডায় কেঁপে উঠছে।

মেয়েটার গলায় কি যেন ছিল। যোসেফ পা না বাড়িয়ে পারল না। কবরখানার দেয়ালের বাইরে আসতেই মেয়েটি বলল, 'জানো, আজ সকাল থেকেই ভেবে রেখেছি, তোমায় সঙ্গে নিয়ে বাবা মার কাছে যাব। আজ সেই সকাল থেকেই বাবা মা আমার কথা ভাবছে। খু-উ-ব ভাবছে। আমার কফিনের ভেতর পর্যন্ত আজ মায়ের চোখের একফোঁটা জল পৌঁচেছে অনেক দিন পর। তুমি আমায় একটা করে ফুল দিতে, তুমিই ব্যাপারটা বুঝবে বলে তোমায় সঙ্গে নিয়েছি।'

রীতিমতো একটা বড়ো মেয়ের মতো কথা বলতে বলতে হাঁটতে থাকল মেয়েটি।

যোসেফ শুধু কথাগুলো শুনতে থাকল। কি বলবে যোসেফ! এখন কেবল তার নির্জন কোনো জায়গায় বসে অঝোরে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে। সেই কান্না চাপবার জন্যেই বোধহয় গলার কাছটা ব্যথা করছে। আপন মনে সে ভগবানকে ডাকতে থাকল আর কাকেই বা ডাকতে পারে সে!

ব্ল্যাক আউটের জন্য ঘন অন্ধকারে ঢাকা নির্জন পথ পায়ে পায়ে ফুরিয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের বাড়ির সামনে এলো যোসেফ আর মেয়েটি। কেন জানি তার মনে হল ভেতরে আলো জ্বলছে।

তাহলে কি মেয়েটির বাবা মা জেগে আছে।

থাকতেও পারে।

পায়ে পায়ে ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল যোসেফ। মেয়েটি পেছনে। একবার

ফিরে অন্ধকারের মধ্যেও মেয়েটির অস্পষ্ট মুখে অসম্ভব বেদনার ছায়া দেখল যোসেফ। বুকের ভেতরটা ভীষণ দুঃখে মোচড় দিয়ে উঠল।

'কি হল কলিংবেলটা বাজাও!' মেয়েটি অধৈর্য গলায় বলল।

কিছু না বলে হাত বাড়িয়ে কলিংবেলের বোতামটা টিপল যোসেফ।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। মেয়েটির বাবা দরজা খুলে দাঁড়ালেন। যোসেফের মুখোমুখি। যোসেফকে দেখে অবাক্ হয়ে গেছেন খুব।

যোসেফ দেখল, তার সেই অবাক্ হওয়া চোখে জল। যোসেফ তার মুখের ওপর থেকে চোখ সরাতে পারল না, কথাও বলতে পারল না।

'কি ব্যাপার, হঠাৎ এতো রাতে?' ভদ্রলোক শুধালেন।

কি বলবে যোসেফ! মুখ ফিরিয়ে একবার মেয়েটিকে দেখতে চাইল।

এ কী! মেয়েটি কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল যোসেফ। আশেপাশে কোথাও মেয়েটি নেই।

ভদ্রলোক ফের বললেন, 'কিছু দরকার আছে নাকি?'

'না। হঠাৎ—হঠাৎ আপনাদের কথা মনে হল।'

থেমে গেল যোসেফ। কি বলবে সে? মেয়েটি হঠাৎ বাতাসে মিলিয়ে না গেলে অন্ততঃ কিছু বলবার থাকত তার।

ভদ্রলোক কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, 'জান, আজ আমাদের একমাত্র মেয়ের জন্মদিন ছিল। এতক্ষণ ওর মা আর আমি ওর ছবির সামনেই বসেছিলাম।'

বলে একটু থেমে ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'কি অবাক্ কাণ্ড জান, এইমাত্র, মানে কলিংবেল বেজে উঠার আগ মুহূর্তে ছবির মধ্যে যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল মেয়েটা। স্পষ্টই দেখেছি ওর চোখের পাতা কেঁপে উঠেছিল, ঠোঁট নড়ে উঠেছিল, অদ্ভুত একটা ফুলের গন্ধ পেয়েছিলাম ওর শরীর থেকে।'

যোসেফ ভদ্রলোকের চোখে উপচে ওঠা জল দেখল। আর দাঁড়াতে পারছে না যোসেফ। ফুঁপিয়ে হয়তো কেঁদে উঠবে সে। মুহূর্তে ফিরে দাঁড়িয়ে দ্রুত পায়ে হাঁটতে থাকল যোসেফ। নির্জন পথে কেবল তার পায়ের শব্দ উঠতে থাকল। অন্তহীন বেদনার ধ্বনি বেজে উঠল সেই পায়ের শব্দে।

সেই থেকেই রোজ সকালে সেই মেয়েটির কবরে একটি করে ফুল দেবেই যোসেফ। যোসেফ তো জানে, সারা রাত মেয়েটি সকালের এই ফুলটির জন্যই অপেক্ষা করে থাকে।

"৺শ্রীপদ দে স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"য় প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

মধুর বাক্য

শর্মিলা রায়

অযোধ্যা নগরী আজ উৎসবে মত্ত। রাবণ বধের পর শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া রাজা হইয়াছেন সেই উপলক্ষে আজ এক যজ্ঞানুষ্ঠান হইতেছে এবং সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণদিগকে সামর্থ্যানুযায়ী দানের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং সে ভার হনুমানের উপর দেওয়া হইয়াছে। সকলেই দান পাইয়া জয়ধ্বনি করিতেছে।

হঠাৎ শ্রীরাম দেখিলেন যে, হনুমান দান ঠিকই করিতেছেন কিন্তু কিছু ব্রাহ্মণ আশানুরূপ দান না পাওয়ায় অভিযোগ করাতে হনুমানের গঞ্জনা লাভ করিতেছে। তখন রামচন্দ্র হনুমানকে ডাকিয়া বলিলেন যে আমার একটি সোনার চাঁপাফুল বিশেষ প্রয়োজন এবং তাহা হিমালয়ে এক সাধুর আশ্রমে পাওয়া যাইবে। তুমি সত্বর লইয়া আইস।

হনুমান তৎক্ষণাৎ 'জয় রাম' বলিয়া লাফ দিলেন এবং অচিরেই সেই আশ্রমে পৌঁছাইয়া দেখিতে পাইলেন যে একটি সোনার চাঁপা গাছের নীচে এক উজ্জ্বল মূর্তি সাধু ধ্যানস্থ অবস্থায় বসিয়া আছেন।

হনুমান সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে সাধুর ধ্যান ভঙ্গ হইল। হনুমানকে দেখিয়া সাধু চিনিতে পারিলেন ও কুশল বার্তা নিয়া তাঁহার আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন।

হনুমান রামচন্দ্রের অনুরোধ জানাতে সাধু আনন্দিত মনে উঠিয়া সেই গাছ হইতে একটি ফুল পাড়িয়া হনুমানের হাতে দিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে আশীর্বাদ জানাইতে বলিলেন।

হনুমান তখন সাধুকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, সাধুবর যদি অপরাধ গ্রহণ না করেন তাহা হইলে আমার মনের একটি দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে, নিবেদন করি।

সাধু সম্মতি জানাইলে হনুমান বলিতে লাগিলেন—"আপনাকে দেখিয়া খুবই উচ্চ-শক্তি সম্পন্ন সাধু মনে হইতেছে। আপনার অঙ্গের প্রভায় ও সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত হইতেছে, স্বর্ণ চাঁপার নীচে হিমালয়ে আপনার আসন কিন্তু প্রভু আপনার মুখমণ্ডল শূকরের মত কেন? এই দ্বন্দ্ব মনে উদয় হওয়াতে বড়ই পীড়া অনুভব করিতেছি। দয়া করিয়া ইহার সমাধান করিয়া দিন।"

সাধু তখন স্মিত হাস্যে কহিলেন—

"নানা দানং ময়া দত্তম
রত্নানী বিবিধানি চ
ন দত্তং মধুরং বাক্যম্
তেনাহং শূকর মুখ।"

হনুমান তো আর দেবভাষা পাঠ করে নাই, যে সাধুর বলা শ্লোকের মানে বুঝিতে পারিবে। তাই বোকার মত তাকাইয়া রহিল।

হনুমান মানে বুঝিতে পারে নাই একথা জানিতে সাধুর একটুও বিলম্ব হইল না। তাই শ্লোকটির অর্থ তিনি ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন। সাধু বলিলেন, "জান হনুমান, নানা রত্ন আমি দান করি কিন্তু মিষ্টি কথা কাউকে বলি না। তাই আমার মুখটা শূকর মুখের মত দেখিতে হইয়াছে।" তখন হনুমান নিজের দোষ বুঝিতে পারিয়া সাধুকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন এবং ক্ষুণ্ণ মনে রামচন্দ্র সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন—"প্রভু, এ শিক্ষা ত আপনিই দিতে পারিতেন! এর জন্য হিমালয়ে যাওয়া বা স্বর্ণ চাঁপা আনার কি প্রয়োজন ছিল?" তখন রামচন্দ্র বলিলেন—"হনুমান, দুঃখ করিও না শুষ্ক উপদেশ অপেক্ষা সেই বিষয়ে প্রমাণ বিশ্বাসের ভিত্তি অনেক দৃঢ় করে। এই বলিয়া রামচন্দ্র হনুমানকে আলিঙ্গন করিলেন।"

---

৮৪৬ পৃষ্ঠার ৯নং প্রশ্নের উত্তর

কাগজটা এইভাবে ভাঁজ করে নিলেই কাজটা সোজা হবে।

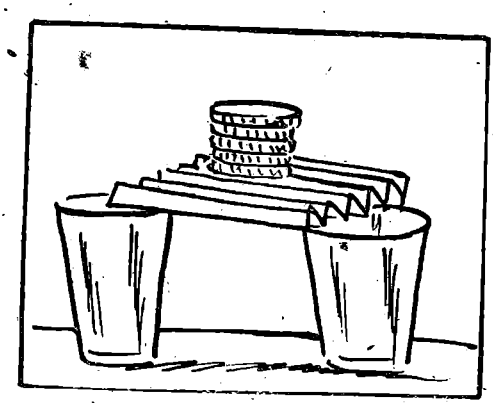

"৺শ্রীপদ দে স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"য়
দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

"বানরের বাঁদরামি"

শ্রীউষারাণী চৌধুরী

রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক। উৎসবমুখর অযোধ্যা। দেশসুদ্ধ লোক নিমন্ত্রিত। রামচন্দ্র তাঁর রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে লোককে দান করছেন। সীতাও দান করছেন, কারণ তিনি শুধু রামচন্দ্রের রানীই নন সহধর্মিণীও। প্রার্থীরা দান নিয়ে তাঁকে কেউ আশীর্বাদ, কেউ বা তাঁর মঙ্গল কামনা করে চলে যাচ্ছেন।

সীতা ভাবলেন হনুমানকেও কিছু দান করবেন। হনুর কৃতিত্ব তো কম নয়। সাগর পেরিয়ে সীতার সন্ধান নেওয়া থেকে শুরু করে যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত আপ্রাণ পরিশ্রম করা। সেই হনুমান বসে আছেন করজোড়ে শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মের কাছে। সীতা তাঁকে নিজ কণ্ঠ থেকে একছড়া মুক্তোমালা দিলেন। হনু তো মালা পেয়ে খুব খুশী। খানিক পরে সীতাদেবী লক্ষ্য করলেন, হনু বসে বসে মালার মুক্তোগুলোকে একটা একটা করে দাঁত দিয়ে ভাঙ্গছেন। দেখেই সীতা আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন—'হুঁ, বাঁদরে মুক্তোর কি বুঝবে? ওকি তার স্বভাব ছাড়তে পারবে?' তিনি বেশ একটু ক্ষুব্ধ স্বরেই হনুকে জিজ্ঞেস করলেন—তিনি ওটা ভাঙ্গছেন কেন? হনু কাজের ব্যস্ততার মধ্যেই উত্তর দিলেন,—'মা, এই মুক্তোর কোথাও তো রাম নাম দেখছি না, তাই ভিতরটা দেখছি, ভিতরে লেখা আছে কিনা।' কথা শুনে সভাসুদ্ধ লোক স্তম্ভিত। শুধু রামচন্দ্রই মৃদু মৃদু হাসছিলেন। সীতা আরও আশ্চর্য হয়ে বললেন—'মুক্তোতে রাম নাম লেখা থাকবে কি?' হনুমান তখন সবিনয়ে বললেন,—'মা, যাতে রাম নাম নেই তা নিয়ে আমি করব কী?' তখন সীতা তাঁকে বললেন—যাতে রাম নাম নেই তা যদি হনুর পছন্দ নয় তবে হনুর দেহটাও তো তাঁর মা পছন্দ হবার কথা, কারণ ওতে রাম নাম লেখা নেই।

হনু তখন বললেন, তা কেন হবে? নিশ্চয়ই তাঁর দেহে রাম নাম আছে। সীতাদেবী বানরের মূর্খতায় হাসছিলেন, কিন্তু তিনি দেখলেন হনু নখ দিয়ে তাঁর বুক চিরে ফেলে দু হাতে বুকের চামড়া ফাঁক করে ধরেছেন, আর সবাই সবিস্ময়ে দেখলেন হনুর চেরা বুকে রাম এই নামটি জ্বলজ্বল করছে।

মানুষ বেচার ব্যবসা

জীবন ভৌমিক

নদীর নাম কালাবা। তার দুই তীরে ঘন জঙ্গল, সারি সারি কত বিচিত্র সব গাছপালা ছাতার মত ডালপালা মেলে আকাশপানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। ঐ নদীর নামেই গ্রামের নাম।

অন্ধকার আফ্রিকার উপকূলে অবস্থিত হলেও কালাবা গ্রামটির চারদিক খুব সুন্দর। অন্ধকারের চেয়ে এখানে আলোই বেশী।

হাজার বছর আগে আফ্রিকার এই ছোট্ট গাঁয়ে যে সব মানুষ থাকত তাদের গায়ের রং ছিল মিশমিশে কালো—দেহে ছিল দানবের শক্তি। বনের জন্তু-জানোয়ারের মাংসই ছিল তাদের খাদ্য। এদের সংসার ছিল, সুখ দুঃখ অভিমান ছিল। মন ছিল শিশুর মত সরল। আফ্রিকার গাছপালা, কালাবা নদীর জল আর মাথার ওপর আকাশ—এ ছাড়া কালো রংয়ের ঐ মানুষগুলো আর কিছু দেখেনি। তাই সেদিন ওরা অবাক্ হয়েছিল। দূরে বিয়াফ্রা উপসাগরের নীল জলের দিকে আঙুল তুলে ওরা সবাইকে ডেকে দেখাল—ঐ যে! পাল খাটানো বিরাট বিরাট জাহাজ হেলতে দুলতে ভেসে আসছে তাদের গ্রামের দিকে।

আফ্রিকার উপকূলবর্তী কালাবার গ্রামের সেই নির্দোষ সরল মানুষগুলো তখনও জানতো না জাহাজগুলো দৈত্যের মত কিসের সন্ধানে আসছে।

প্রথম জাহাজ পাঠিয়েছিল পর্তুগালের সম্রাট্। ১৪৪৪ সাল থেকে অনেক দেশের জাহাজ আফ্রিকার উপকূলে ঘুরে বেড়িয়েছে গোলামের সন্ধানে। আফ্রিকা থেকে হাজার হাজার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ জাহাজ বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হত। ১৬৭৯ সাল থেকে ১৭০০ সালের মধ্যে শুধু ইংরাজরাই দেড় লক্ষ কালো মানুষ ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

যতবার জাহাজ আসে আর চলে যায় ততবার বেশ কিছু মানুষ নিখোঁজ। জাহাজ দেখলে তাই তখন কালাবার মানুষগুলো বনে লুকিয়ে পড়ত।

বোস্টন থেকে ক্যাপ্টেন স্মিথ যখন তার রেইন-বো জাহাজ নিয়ে আফ্রিকার গিনিতে এসে থামল তখনও সেইখানকার মানুষগুলো জঙ্গলে লুকিয়ে পড়েছিল। জাহাজ থেকে কামান বন্দুক নামিয়ে একটা শান্ত গ্রামের ওপর চড়াও হল স্মিথের লোকেরা। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত গ্রাম জ্বলে ছাই হয়ে গেল। বন-জঙ্গলের পশুরা

পর্যন্ত চীৎকার করতে লাগল। তারপর স্মিথের দল সেই গ্রাম থেকে বেছে বেছে প্রায় আড়াইশ কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ লোহার শেকল দিয়ে বেঁধে জাহাজে তুলে নিয়ে চলে গেল।

এইভাবে কত স্মিথ এসে আফ্রিকার মানুষ ধরে নিয়ে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বিক্রী করে লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করত তার পুরো হিসেব এখনও কেউ দিতে পারেনি। ১৭৫৩ সালে এই সব মানুষের গড় বিক্রয়মূল্য ছিল প্রায় চারশ' টাকার মত। পরে পৃথিবীর বিভিন্ন উপনিবেশগুলোতে তুলো এবং তামাক চাষ বেড়ে যাওয়াতে দৈহিক পরিশ্রম করার কাজও বেড়ে গেল। ফলে এই সব কালো মানুষগুলোর চাহিদাও বাড়ল।

যে সব জাহাজে করে এইসব মানুষ ধরে নিয়ে যাওয়া হত তার বর্ণনা শুনলে পৃথিবীর প্রতিটি সভ্য মানুষ লজ্জায় মাথা নত করবে। জাহাজের ভিতরকার সেই ভয়ানক নির্মম অবস্থার কথা শুনলে বোধ হয় শয়তানের চোখেও জল আসবে।

পঞ্চাশ ফুট লম্বা, পঁচিশ ফুট চওড়া—উচ্চতা মাত্র চার ফুট এমন একটা জাহাজের খোলের মধ্যে একজনের হাত পা আরেকজনের সঙ্গে বেঁধে এক একবারে আড়াইশ জনকে নিয়ে যাওয়া হত। শেকলগুলো জাহাজের দেওয়ালের সঙ্গে বাঁধা থাকত। চার ফুট উঁচু খোলের মধ্যে দাঁড়ানো তো দূরের কথা উঠে বসাও যেত না। দিন রাতে মাত্র দু'বার খাবার দেওয়া হত। বেশী খাবার চাইলে অথবা অসময়ে জল চাইলে সপাং সপাং চাবুক পড়ত। এইভাবে জাহাজ ভেসে চলত দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। নির্দিষ্ট জায়গায় যখন জাহাজ পৌঁছুত তখন দেখা যেত জাহাজের অন্ধকার খোলের মধ্যে বেশ কয়েকজন মৃত।

জাহাজ থেকে নামাবার সময় এই 'ক্রীতদাস'দের বুকে গরম লোহার ছাপ মেরে দেওয়া হত। মানে কোম্পানির ছাপ। যে কিনবে তার ছাপ থাকত ক্রীতদাসের কপালে। সে-ও গরম লোহার ছাপ।

এই বর্বর ক্রীতদাস-প্রথা সভ্য পৃথিবীতে বহুদিন চলেছে। এক সময় পৃথিবীর সর্বত্রই গোলামের হাট বসত। উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে আমাদের এই কলকাতাতেই প্রতিদিন নৌকা বোঝাই করে অসংখ্য ছেলেবুড়োকে আনা হতো বিক্রয়ের জন্য। খবরের কাগজে তখন বিজ্ঞাপন দেওয়া হত এইভাবে—কর্মক্ষম আফ্রিকান ক্রীতদাস বিক্রয় হইবে। মূল্য মাথা পিছু চারশ সিক্কা টাকা।

এইসব ১৮৪০ সালের কথা। ১৮৬২ সালে বাংলা-বিহার উড়িষ্যায় মোট ক্রীতদাসের সংখ্যা ছিল একচল্লিশ লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার।

ওয়াশিংটন যখন মানুষের স্বাধীনতার কথা চিন্তা করছে, আমাদের রামমোহন রায় যখন বিশ্ব-মানবতার কথা ভাবছেন, তখন আফ্রিকা জঙ্গলের শান্তিপ্রিয় মানুষ-গুলোকে হাতে পায়ে শেকল বেঁধে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চালান করা হচ্ছে।

কিন্তু এমন করে বেশীদিন চলল না। ক্রীতদাসেরা একদিন বিদ্রোহের আগুন জ্বালাল। সে আগুন নেভায় কার সাধ্য। আফ্রিকার অন্ধকারের পর্দা ভেদ করে একদিন মুক্তির দামামা বেজে উঠল। একই আকাশের তলায় মানুষের সন্তান মানুষের মত বাঁচতে চায়। জীবনকে তারা ভাল-বাসে, মৃত্যুকে তাই তারা পরোয়া করে না!—

অসময়ে জল চাইলে সপাং সপাং চাবুক পড়ত।

[পৃষ্ঠা ৯০৬

'ক্রীতদাস বিদ্রোহের' সেই আগুনে কত জাহাজ পুড়েছে, কত উপনিবেশ ছাই হয়ে গেছে। সারাজীবন যারা যন্ত্রণায় নীরব অশ্রু ঢেলেছে, তাদের সমবেত কণ্ঠ থেকে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে নির্গত হল—আমরা মানুষের মত বাঁচতে চাই!

লক্ষ লক্ষ বিদ্রোহী ক্রীতদাসের রক্তে সেদিন বুঝি বা অন্ধকারের রংও লাল হয়ে গিয়েছিল।

মানুষের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে সেদিন পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে অনেক মহান পুরুষের উচ্চকণ্ঠ ঘোষিত হয়েছিল।

এইভাবে ধীরে ধীরে সমস্ত জগৎ থেকে মানুষ বেচার এই ঘৃণ্য নারকীয় ব্যবসার অবলুপ্তি হল। আফ্রিকার জঙ্গলের অন্ধকার মুক্তির আলোয় আলোকিত হল।

রাজার শাস্তি

মুরারি মোহন মণ্ডল

গ্রীসদেশে এক রাজা ছিলেন। তিনি যেমন বীর তেমনি সাহসী। তাঁর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে দেবতারাও তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলেন। কখনও দেবতারা খুশী হয়ে তাঁকে স্বর্গে নিয়ে যেতেন নিমন্ত্রণ করে, কখনও রাজার অনুরোধে দেবতারা মর্ত্যে আসতেন নিমন্ত্রণ খেতে।

বেশ চলছিল সুখে স্বচ্ছন্দে রাজার রাজত্ব। কিন্তু সব সুখ মানুষের ভাগ্যে আর সইবে কেন। দেশের লোকের নিত্য নিয়মিত সেলাম পেয়ে আর দেবতাদের মিষ্টি ব্যবহারে রাজার মাথাটা গুলিয়ে গেল। মনে হতে লাগল শুধু মানুষ কেন দেবতারাও তাঁর আদেশ পালন করে চলবে।

মানুষের অহংকার হলেই দেখা যায় তার পতন ঘনিয়ে এসেছে। রাজার মনে অহংকার হতে কুপ্রবৃত্তির উদয় হল। দেবতাদের প্রতি তাচ্ছিল্যের ভাব জেগে উঠল। একবার তিনি তাঁদের নিমন্ত্রণ করে এনে মানুষের মাংস কেটে রান্না করে খেতে দিলেন।

রাজার মনের ভাব জানতে দেবতাদের দেরি হল না। তারপর মানুষের মাংস খেতে দেওয়ায় তাঁরা ভয়ানক চটে গিয়ে তাঁকে নির্মম শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করলেন। রাজার প্রেতাত্মা মৃত্যুর পর যমপুরীতে এলে তাঁরা এক দিঘিতে রাজার প্রেতাত্মাকে বসিয়ে দিলে। দিঘির টলটলে জল রাজার বুক পর্যন্ত উঠে এল। তৃষ্ণার্ত হয়ে রাজা সেই জল পান করবার জন্যে যেমন মুখ নীচু করলেন অমনি দিঘির জল হড়হড় করে অদৃশ্য হয়ে গেল। জলপান করতে না পেরে রাজা মুখ তুললেন। রাজা মুখ তুলতে আবার কোথা থেকে জল এসে রাজার বুক পর্যন্ত উঠে তাঁকে লোভ দেখাতে লাগল। রাজা আবার জল খেতে মাথা নীচু করলেন আবার জল অদৃশ্য হয়ে গেল। এইভাবে আজও যমপুরীতে রাজা তৃষ্ণার্ত হয়ে দিঘিতে বসে আছেন।

সেই রাজার নাম ট্যাণ্টালাস।

গল্পটা শুনে তোমরা হয়তো ভাবছ এটা হয়তো আজগুবী কাহিনী। কিন্তু তোমরা বড় হয়ে যখন বিজ্ঞানে ট্যাণ্টালাস কাপের কথা পড়বে তখন জানতে পারবে কাহিনীর সবটাই গাঁজাখুরী নয়। বিজ্ঞানে ট্যাণ্টালাস কাপের কথা লেখা আছে। সেই কাপে রাজার প্রতিমূর্তি বসান আছে। কাপের জল মূর্তির ঠোঁট পর্যন্ত উঠলেই মুখে যাবার আগেই কাপ শূন্য হয়ে যায়। কি করে এই অদ্ভুত কাণ্ড হয় তা বিজ্ঞানের বইতে ভাল করে লেখা আছে। রাজার শরীরের ভেতর একটা শুরু নল ইংরাজী U উলটো U আকারে বসান আছে। তার একটা বাহু ছোট আর একটা বাহু বড়। জল যখন উলটো U এর মাথা পর্যন্ত আসে তখন বড় নল দিয়ে কাপের সব জলটা হু হু করে বেরিয়ে যায়। বিজ্ঞানে এই পদ্ধতিকে বলে সাইফনের নিয়ম।

দেবতারা সর্বজ্ঞ। তাঁরা এইভাবে দিঘিতে গোপনে নল বসিয়ে রাজা ট্যাণ্টালাসকে সাজা দিয়েছিলেন।

আসামের ধুবড়ি হইতে শ্রীপ্রফুল্লকুমার নাগ ও তাঁর ভাইবোনেরা পাপড়ি, যুঁই, দুলাল, বাবলু প্রভৃতি তাঁদের স্বর্গগত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মলয়-কুমার নাগের পুণ্যস্মৃতিরক্ষাকল্পে একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রস্তাব করেছেন।

তাঁর প্রস্তাব অনুসারে আমরা

"৺মলয়কুমার নাগ স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"

নামে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা আহ্বান করছি।

জন্ম :- ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৮.
মৃত্যু : ১০ই অক্টোবর, ১৯৭২

প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু :

স্বামী বিবেকানন্দের বলা অলৌকিক কাহিনী.

রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ : ৩০শে ফাল্গুন, ১৩৮০। প্রতিযোগিতার ফলাফল ও পুরস্কার-প্রাপ্ত রচনা আগামী জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১ সংখ্যা শুকতারায় প্রকাশ করা হবে।

প্রথম পুরস্কার পনের টাকা ● দ্বিতীয় পুরস্কার দশ টাকা

মজার পাতা

নতুন ধাঁধা

১। নীচের বাক্যগুলির মধ্যে কয়েকটি পশু, পাখি আর মাছের নাম লুকান আছে। বের কর দেখি।

"নিবারণবাবু তন্তুবায় সম্প্রদায় সভার সম্পাদক। খাসা রসজ্ঞ লোকটি, অতি মিতব্যয়ী। সাহেবী পোশাক পরতে হয় বটে, কিন্তু টুপি কম ব্যবহার করেন। তাঁর পালিতপুত্র শিশু শুকলাল নূতন নামকরণে এখন পুরোহিত কুমার হয়েছে। স্বাস্থ্য খারাপ বলে সে পড়ায় অনেক পিছনে পড়েছে।" —চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্ব ভাটপাড়া।

২। দু অক্ষরে আমার নাম থাকি সবার ঘরে,
আমাকে হারালে রাজা রাজ্য যায় ছেড়ে।
আমি যদি ভেঙ্গে যাই সৈন্যদল মাঝে,
দিশেহারা হবে, পথ পাবে নাকো খুঁজে। —প্রহলাদচন্দ্র সোম, বার্নপুর, বর্ধমান।

৩। লিখতে তুমি পারো
যদি মুখখানটা ছাড়ো,
আলো নয় যেন
চোখ ঝলসানো! —শেখর সেন, আসানসোল।

গত অগ্রহায়ণ সংখ্যার ধাঁধার উত্তর

১। পাথর ২। দেরা ৩। ৩০+৩১+৩২+৩৩+৩৪+৩৫ (30 to 35)

গত অগ্রহায়ণ সংখ্যার ধাঁধার নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম

কলিকাতা—বিশ্বনন্দন, উল, স্মৃতি ও কবিতা দাশ—গর্চা ফার্স্ট লেন; দেবু, দুর্গা, শিবু ও শ্রাবণী গাঙ্গুলী—কলুপাড়া লেন; দিদা, পিসি, মা, বাবা ও উদয়ন মুনসী—এস. কে. দেব রোড; বাণী, সুকুমার ও রাজু মুখার্জী—জগন্নাথ ঘোষ রোড; বাণী, নচিকেতা ও অনিরুদ্ধ, সাধু—পর্ণশ্রী পল্লী।

২৪ পরগনা—গৌতম, চঞ্চল, ইন্দ্রজিৎ ও অভিজিৎ মিত্র—মাহিনগর; আবীর, চন্দন, কেয়া, অতনু ও সুখা—বারাকপুর; নীলাদ্রি, হিমাদ্রি, ধীমান ও বৈশাখী নাহা—বিরাটী।

হাওড়া—পান্নালাল নাহা—চেঙ্গাইল; মীরা, চন্দন, তুলসী ও গৌরদাস কর্মকার—চককাশী; শিপ্রা, বুবুল, স্বাতী, মিতা, মা ও বাবা—বি. ই. কলেজ।

হুগলী—সমীর, সলিল, কাজল, ছন্দা ও সীমা বসু—বৈদ্যবাটী; দাদু, বড়মা, সিক্তা, রবীন ও চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—নারায়ণপুর; মিলু, লাণ্ড, রীণা ও রিজা—কাঁঠালুগড়িয়া।

মেদিনীপুর—মা, দেবদাস, হরিদাস ও তুলসীদাস গাঙ্গুলী—পাটনা বাজার।

বাঁকুড়া—মিঠু, ঝুমা, রুমা, দিপা, পিন্টু মামা, মানস ও মাধব বন্দ্যোপাধ্যায়।

মালদহ—শিবু, সীমু, বাবুয়া ও বিবি—মালদহ।

পুরুলিয়া—বিশ্বনাথ, মুকুল, অরবিন্দ, বিধান, জগবন্ধু ও সুদেব মাজী—ঝাঁপড়া; পার্থপ্রতিম ও দীপ্তিমান মাজী—ঝাঁপড়া; মধুমিতা, শ্যামল, কমল, অমল, শঙ্কর, পার্থপ্রতিম প্রভৃতি—আনাড়া; মিলন সাহিত্য ভবনের সভ্যগণ—ঝাঁপড়া।

আসাম—করবী, পূরবী ও মা—মালিগাঁও।

মধ্যপ্রদেশ—গোপাল, খোকন, রীণা ও খোকা—বিলাসপুর।

"আমার প্রিয় কোলে মারী
চাই-ই চাই"—মিনু

কোলে বিস্কুট কোং
প্রাইভেট লিমিটেড,
কলিকাতা-১০

বাজারের সেরা অভিধান—

সুবলচন্দ্র মিত্র প্রণীত

নূতন মুদ্রণ

সরল বাঙ্গালা অভিধান মূল্য টা. ২৮·০০

ডাকমাসুল সহ টা. ৩৩·০০ স্থলে টা. ২৮·০০ অগ্রিম পাঠালে রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠান হচ্ছে

Century Dictionary (ENG.-BENG.) Price Rs. 13·00

Century Dictionary (BENG.-ENG.) Price Rs. 13·00

ডাকমাসুল সহ টা. ১৬·০০ স্থলে মাত্র টা. ১৩·০০ অগ্রিম পাঠালে রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠান হচ্ছে

Pocket Dictionary (ENG.-BENG.) } শীঘ্রই নূতন সংস্করণ
Pocket Dictionary (BENG.-ENG.) } প্রকাশিত হচ্ছে

NEW BENGAL PRESS (Private) Ltd., 68, College Street, Calcutta-12

মঙ্গলের ভয়ংকররা পালিয়েছে!
গল্প • অদ্রীশ বর্ধন ছবি • নারায়ণ দেবনাথ
মঙ্গলগ্রহের আগন্তুকরা পৃথিবী আক্রমণ করেছিলো এবং বেধড়ক পিটিয়ে পৃথিবীবাসীদের ঠাণ্ডা করেছিলো। কিন্তু শেষকালে নিজেরাই পড়লো ফ্যাসাদে। যাদের শুধু চোখে দেখা যায় না, তাদের আক্রমণে বেচারীরা ঘায়েল হতে লাগলো একে একে। এই পর্যন্ত জানা যায় ওয়েলস সাহেবের 'ওয়ার অফ দি ওয়ার্ল্ডস' উপন্যাস আর সিনেমায়। তারপর কি হলো তা জানা যাবে এই কাহিনীতে
বিখ্যাত আবিষ্কারক প্রফেসার নাট-বল্টু-চক্র গবেষণা মন্দিরে এক্সপেরিমেন্ট করছেন —
এমন সময়
মরেছে! এখুনি তো নীল রশ্মি দিয়ে আমাকে ছাই করে দেবে।
অমনি টেলিপ্যাথিতে কথা বলল মঙ্গলজীব।
হ্যাঁ, এখুনি ছাই করবো তোমাকে। তার আগে বলতে পারো কেন আমরা ধুঁকতে ধুঁকতে কুপোকাৎ হচ্ছি?
জানি বইকি। জীবাণুর জন্যে।
জীবাণু! অদৃশ্য অস্ত্র না কি?
অস্ত্র নয় — যাদের চোখে দেখা যায় না, অণুর মতো যে সব জীব, তারাই হলো জীবাণু। মানুষের শরীরে এদের অনেকেই রোগ নিয়ে আসছে। কিন্তু আমরা লড়ে বেঁচে আছি, অভ্যস্ত নও বলে তোমরা কুপোকাৎ হলে।
কি করে এদের জব্দ করা যায় জানো?
জানি। কিন্তু একটি সর্তে বলবো।
কি সর্ত?
পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে তোমাদের।
রাজী।

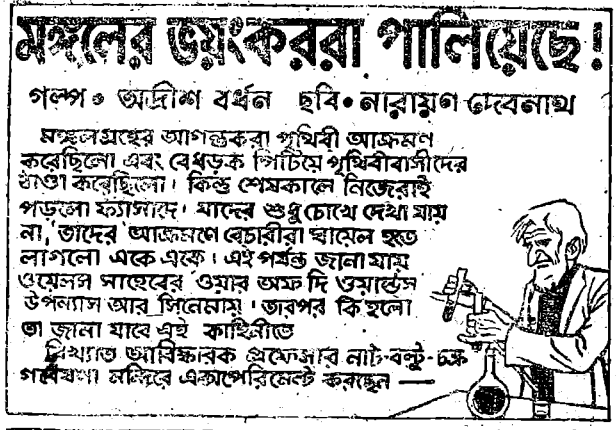

প্রফেসর তখন এটা সেটা মিশিয়ে —
বিস্তর ধোঁয়া ছেড়ে —
অনেক দুমদাম আওয়াজ করে একটা সাবান বানালেন।
ব্যস, তৈরি।
এই সাবান মেখে রোজ গায়ের ধুলোবালি ময়লা সাফ করবে, খাওয়ার আগে হাত-পা-শুঁড় ধুয়ে নেবে — দেখবে পেটের অসুখ হবে না— জীবাণুরা জব্দ হবে।
পরের দৃশ্য।
মঙ্গলের বিশাল স্পেশশিপগুলো পিঠটান দিচ্ছে পৃথিবী ছেড়ে।
ডাক্তার বেনজিটল সাবান দিলে, তাই বেঁচে গেলাম এ-যাত্রা। মহাজাগতিক জাহাজ বোঝাই করে তোমাদের বেনজিটল সাবান নিয়ে যাচ্ছি— যাতে পৃথিবীর জীবাণুরা মঙ্গলে গিয়েও উৎপাত করতে না পারে।
Benzitol
SOAP

নতুন-ফসফোমিন নির্মাতাদের দ্বারা তৈরী আরেকটি উৎপাদন

ফসফোমিন আয়রন

...কারণ মেয়েদের জন্যে আয়রনের বেশী প্রয়োজন হয়

মেয়েদের জন্যে আয়রনের দরকার অনেক বেশী। কারণ প্রতি-মাসে তাঁদের শরীর থেকে আয়রন বেরিয়ে যায়। শরীরের পক্ষে আয়রন খুবই দরকার। তাই আয়রনের এই ঘাটতি পূরণ করাও প্রয়োজন।

গর্ভাবস্থায় আর শিশুকে স্তন্যপান করাবার সময় প্রত্যেক স্ত্রীলোকের আরো বেশী আয়রনের প্রয়োজন হয়। কারণ সন্তানের জন্যেও তো আয়রনের দরকার!

আয়রনের এই ঘাটতি পূরণ করতে আর শরীরে যথাযথ মাত্রায় আয়রন বজায় রাখতে আপনি নিন ফসফোমিন আয়রন—প্রতিটি নারীর জন্যে একটি অত্যাবশ্যক টনিক।

ফসফোমিন আয়রন স্বাস্থ্যকর লাল রক্ত-কণিকা গড়ে তোলে আর আপনার যৌবনশ্রী ফিরিয়ে আনে।

ফসফোমিন আয়রনে সব ভিটামিন ও খনিজ পদার্থও পাবেন। ফলে আপনি হয়ে উঠবেন যেমন কর্মঠ তেমনি প্রফুল্ল।

আজ থেকেই ফসফোমিন আয়রন খেতে শুরু করুন। প্রত্যেক দিন নিন ফসফোমিন আয়রন

সব কেমিস্টের দোকানে ২টি সাইজে পাওয়া যায়:
২২০ মি. লি. ও ৪৮০ মি. লি.।

নতুন!
ফসফোমিন আয়রন—
মেয়েদের জন্যে বিশেষ
ফর্মুলায় তৈরী
প্রথম টনিক

SQUIBB SARABHAI CHEMICALS

ফসফোমিন করমচাঁদ প্রেমচাঁদ প্রাইভেট লিমিটেডের একটি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।
® ই. আর. স্কুইব অ্যাণ্ড সন্স ইনকর্পোরেটেডের রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক আর লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবহারকর্তা হলেন কে পি পি এল।

Shilpi-HPMA-7A/73 Ben

"শুকতারা"

বর্ণানুক্রমিক বার্ষিক সূচী

ষষ্ঠবিংশ বর্ষ

ফাল্গুন, ১৩৭৯—মাঘ, ১৩৮০

[* তারকাচিহ্নিত রচনাগুলি সাহিত্য-প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত]

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
অদৃশ্য শত্রুর যম (জানবার কথা) ...	— ...	২৫৩
অদৃশ্য হওয়া (মজার ছবি) ...	— ...	৩৯৬
অনন্ত লক্ষ্মণ কাহেরি (শহীদ স্মৃতি কথা) ...	রঞ্জন মিত্র ...	১৮৮
অপরাজিতা মেয়ে (জীবন কথা) ...	শ্রীরঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৪৫৮
* অপরাধী ...	সন্তোষকুমার মালাকার ...	১৪৪
অপরাধীর পুরস্কার (গল্প) ...	মদনমোহন রায় ...	৩৬৬
অপূর্ণ থাকে না ...	পূরবী দেবী ...	৮৩২
* অবতার ...	শ্রীমির্মলেন্দু নাথ ...	৩০৩
* অভিমানী ভুলি ...	চিন্ময় গুহ	৩৭২
অমর শত্রু (জানবার কথা) ...	— ...	৭৯১
অমূল্য দান (জীবন-কথা)	শৈলেশ ভড় ...	৩৩০
* অলৌকিক ...	শশাঙ্কশেখর ঘটক ...	৬০৫
আলবার্ট আইনস্টাইন (জীবন-কথা) ...	শৈলেশ ভড়	২৭৩
আইন ভবন (জানবার কথা) ...	—	৫০৫
আগুন থামাতে ও জ্বালাতে অগ্নিবাহিনী (জানবার কথা)		৩০৬
আজব ছবি (মজার ছবি) ...	— ...	৬২৩, ৮২৫
আজব সালসা (কবিতা) ...	অরুণ চট্টোপাধ্যায়	৩৮৭
আবিষ্কার (জানবার কথা)	— ...	১৮১
আশ্চর্যের কথা (জানবার কথা)	— ...	৩৩৮
আসল কথা (কবিতা) ...	শ্রীপুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৫৪১
অ্যাপিলের গবেষণা (বিদেশী গল্প) ...	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা ...	৮৬৭
ইচ্ছার ফল ...	রিপ্পে ...	৩০৭

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
ইন্টারভিউ (গল্প) ...	জীবন ভৌমিক ...	২১৯
ঈশপের গল্প (সত্য ঘটনা) ...	গোবাচাঁদ পাল ...	৮৮৪
ঈশ্বরীবর্ষণ মৌখরী (অমর বীর কাহিনী)	শ্রীমধুসূদন মজুমদার ...	৪৭০
উৎকলকেশরী কপিলেন্দ্র (অমর বীর কাহিনী)	(ঐ) ...	১৩৩
উৎকলেন্দ্র মুকুন্দ হরিচন্দন ...	(ঐ)	২৪৪
এক অদ্ভুত জীব (মজার ছবি) ...	— ...	৪৭৮
এক জাহাজ ভূত (বিদেশী গল্প) ...	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা ...	৩৯৭
এক দিনের রাজা (গল্প) ...	নীহারেন্দু দাস ...	৫৫৭
একটি ইতিহাস বিখ্যাত চোর (গল্প) ...	জীমূতকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৫৭৯
এত সুন দিচ্ছে কে (জানবার কথা) ...	— ...	১৮১
কবরের বিভীষিকা (সত্য ঘটনা) ...	অদ্রীশ বর্ধন ...	৭১৬
করতে পার (মজার ছবি) ...	— ...	১০১
করলে তোমরাও পার (জানবার কথা) ...	— ...	১৪১
কলিঙ্গ সিংহ পুরুষোত্তম গণপতি (অমর বীর কাহিনী) ...	শ্রীমধুসূদন মজুমদার ...	৭০৫
কলে কাগজ তৈরী (প্রবন্ধ) ...	পূরবী দেবী ...	৫১৬
"৺কাজলকুমার রায় স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা" (ঘোষণা) ...	— ...	৮৩৯
"৺কামনবালা ঘোষ স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা" (ঘোষণা) ...	— ...	৭০
* কাপুরুষতার ফল ...	এম. আব্দুল ...	৩৬৯
কার্টুন ...	— ...	৬৪১, ৬৭৬
কি আশ্চর্য (মজার ছবি) ...	— ...	৪৯০, ৬৮৮
কিশোর বিচারক (গল্প) ...	শৈলেশ ভড় ...	৭০১
কিম্বদন্তি (কবিতা) ...	অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায় ...	৮৩৭
কী অদ্ভুত জন্তু (মজার ছবি) ...	— ...	৭১৩
কুতুর চ্যালেঞ্জ (মজার ছবি) ...	— ...	৬৭৮
কে আমেরিকা আবিষ্কার করে ? (জানবার কথা)	...	৩৮৩

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
খোঁজাখুজি খেলা (মজার ছবি) ...	— ...	৩১২
গদর পার্টি ও কোমাগাটা মারু (শহীদ স্মৃতি কথা) ...	রঞ্জন মিত্র ...	৮৯২
গদরের প্রতিধ্বনি (শহীদ স্মৃতি কথা) ...	রঞ্জন মিত্র ...	৫১৯
গবেষণা চলছে (জানবার কথা) ...	— ...	২২৮
* গল্প নয় ...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ গোস্বামী ...	৬৮
গুরুতর বিপদ (ভৌতিক গল্প) ...	দেবকুমার চৌধুরী ...	৮১৭
ঘুম (গল্প) ...	পরিমলকুমার দে ...	৪৯১
ঘোঁতনদার বিয়েতে (গল্প) ...	জীবন ভৌমিক ...	৪১৭
ঘোড়ার ডিম (কবিতা) ...	নয়নরঞ্জন বিশ্বাস ...	৭৯
চক্ষু চড়ক গাছ (কার্টুন) ...	— ...	৭৪
* চিকিৎসা বিজ্ঞানের রূপকথা ...	অরিন্দম রায় ...	৮২২
চোখ ছানাবড়া (হাসির কথা) ...	— ...	৪৬৯
ছবিতে কি ভুল আছে বল তো ? (মজার ছবি) ...	— ...	১৯৩
ছেলে মাথায় ওঠে ...	রিপ্লে থেকে ...	৫৯১
জবর দখল (বিদেশী গল্প) ...	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা ...	২৩৫
জলের প্রয়োজন (জানবার কথা) ...	— ...	৮০৫
জাদিগ (বিদেশী গল্প) ...	তৃপ্তিকণা দত্ত ...	৫৯
জাদুকর বৈজ্ঞানিকের গল্প (জীবন কথা) ...	শ্রীবিশ্বনাথ দাস ...	৫৬৬
জাবালজা ও টারজান (অ্যাডভেঞ্চার) ...	সব্যসাচী ১৯৪, ২৮৬, ৩৫৫, ৪৩৯, ৫০৬, ৫৯৪, ৬৫৭, ৭২২, ৮০৯, ৮৭৩	
জীবন মৃত্যুর লটারি (বিজ্ঞান) ...	শ্রীবৈজ্ঞানিক ...	২৬৪
* জীবন্ত মাটির মূর্তি ...	অজিতকুমার বসু ...	৬০২
জীবন্মৃতের জাদুঘর (বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ) ...	শ্রীবৈজ্ঞানিক ...	৬২৯
ডলার আসছে (জানবার কথা) ...	— ...	২৯৪
ডাকাতের যম ঢেঁকি (জীবন কথা) ...	অম্বুজেন্দ্র ঘোষ ...	৫২৫
ডানপিটে ভগবান (পৌরাণিক গল্প) ...	নটরাজন ...	৫, ৩৭৫

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
ভাচ্ছিল্য করা উচিত নয় (জানবার কথা) ...	— ...	৩০৬
তাচ্ছিল্য করা ভাল নয় (জীবন কথা) ...	—	৭৬২
তাঞ্জুভুরেশ্বর কারিকাল (অমর বীর কাহিনী)	শ্রীমধুসূদন মজুমদার	৭৬৩
তেতলার লাল কামরা (বিদেশী গল্প) ...	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা ...	১৫৮
তেরো ডাইনির মজলিশ ঐ ...	(ঐ) ...	৬৪৪
তোমরা রেখো জেনে (কবিতা) ...	মণ্টু সরকার ...	৬১৩
দশ লাইট ইয়ার দূরত্বে (বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ) ...	শ্রীবৈজ্ঞানিক ...	৭৭৩
দীর্ঘ ভ্রমণ পাথী (জানবার কথা) ...	— ...	৭৯৭
দুইয়ে দুইয়ে চার (মজার কথা) ...	— ...	৫৭৮
দেহান্তরী (বিদেশী গল্প) ...	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা ...	৫৪৮
ধর্মরাজ ইস্পল চোল (অমর বীর কাহিনী)	শ্রীমধুসূদন মজুমদার ...	৪০৮
নটিলাস (জীবন কথা) ...	সুনীলরঞ্জন দত্ত ...	৬৩৯
নতুন গাড়ি (জানবার কথা)	— ...	৪৫৭
নবসাজে শালক হোমস্ (গোয়েন্দা কাহিনী) ...	শৈলেশ ভড় ...	১১২
* নবাবের ভ্রাতৃস্নেহ ...	শ্রীরেবতীকান্ত গোস্বামী ...	২২৬
নিকোলাসের গল্প (জীবন কথা) ...	তাপসেন্দ্রনাথ বসু ...	৬২৪
* নিজের ফাঁদে ...	শ্রীঅশোকবরণ চক্রবর্তী ...	৪৫৪
নীল সোয়েটার (বিদেশী গল্প) ...	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা ...	১৩
পরখ করা (কবিতা) ...	আশা দেবী ...	৪৬৫
"৺পরিমল স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা" (ঘোষণা) ...	— ...	৪৫৯
* পারানি	শ্রীআনন্দকুমার বসু ...	২২৩
পিল্ পিল্ মামা (কবিতা) ...	শ্রীপুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৬৮৭
পৃথিবী যখন ধ্বংস হল (বিজ্ঞান) ...	শ্রীবৈজ্ঞানিক ...	৪২৭

বিষয়	লেখক-লেখিকা		পৃষ্ঠা
পৃথিবীর নবম আশ্চর্য	... (ঐ)	...	৪৪৭
পৃথিবীর সব থেকে ধনী উত্তরাধিকারী	... রিপ্লে	...	২৩৪
প্রকৃতির খেয়াল (জানবার কথা)	... —	...	৪
* প্রতিশোধ	... শ্রীরজত দাশগুপ্ত	...	৭৫৩
প্রতিহার-সম্রাট বৎসরাজ (অমর বীর কাহিনী)	... শ্রীমধুসূদন মজুমদার	...	৫৭০
প্রথম হার্ট-অপারেশন (প্রবন্ধ)	... অন্নদিমাথ আচার্য	...	৪১
প্রেসিডেন্টের বাড়ি (ঐ)	... —	...	৫২৭
ফকিরের মাদুলি (সত্য ঘটনা)	... সুশীল দাশগুপ্ত	...	২০২
* ফলন্ত ব্যাটারী	... শ্রীঅদিতিকিশোর সরকার	...	৬৭৯
ফাটকের সেই মূর্ত্তিটি (গল্প)	... পরিমলকুমার দে	...	৮৬২
ফাঁসি-দেওয়ার চর (বিদেশী গল্প)	... শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা	...	৭৪২
ফাঁসির পরে অট্টহাসি (বিদেশী গল্প)	... (ঐ)	...	৩১৯
ফেঁসে গেলেন ঢেঁকিদা (গল্প)	... প্রবুদ্ধ	...	২৯৫
বন্ধু একেই বলে (জীবন কথা)	... অরুণ দে	...	১৭৯
বরাত (জানবার কথা)	... —	...	২২৮
বল দেখি (মজার ছবি)	... —	...	৫৬৩
বলছি মশাই (কবিতা)	... অরুণ চট্টোপাধ্যায়	...	৩
বাতাসের চেয়ে হালকা বেলুন (জানবার কথা)		...	৩৬৮
* বানরের বাঁদরামি	... উষারাণী চৌধুরী	...	৯০৪
বাঁটুল দি গ্রেট	... নারায়ণ দেবনাথ	প্রতি সংখ্যায় প্রথম ছবি	
বিক্রমাঙ্ক ত্রিভুবনমল্ল (অমর বীর কাহিনী)	... শ্রীমধুসূদন মজুমদার	...	১৬৯
বিচারালয় (জানবার কথা)	... —	...	৬৫৬
বিজ্ঞানের টানে (ঐ)	—	...	৩৭৪
বিদ্যাসাগর কথা (জীবন কথা)	... স্বাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী	...	৭৯৪
বিপদ (কবিতা)	... শ্রীঅশোক সী	...	৭৬১
* বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদন	... কৃষ্ণা আচার্য	...	৫৩৩

বিষয়	লেখক-লেখিকা		পৃষ্ঠা
বিভূতিভূষণ ও বালক কবি (জীবন কথা)	হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৬৭৭
বিরাট একটি ডিম (বিদেশী উপকথা) ...	অণিমা দে	...	৩১৩
বিলিতী ভূতচতুর্দশী (বিদেশী গল্প) ...	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা	...	৯০
বিশ্বাস হবে কি ? (জানবার কথা) ...	—	...	৮৯
বিশ্বাসের কথা (জানবার কথা) ...	রিপ্লে	...	৪৯৫
বিষম বাধা (মজার ছবি) ...	—	...	৫১
বিষুব রেখার অন্তরালে (ধারাবাহিক কাহিনী) ...	শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বসু	...	৫৪, ১২৬
বিষ্যুদবারের গেরো !! (ভ্রমণ কাহিনী) ...	সবিতা ঘোষ	...	১১৭
বুদ্ধিই বল (জানবার কথা) ...	—	...	৭৭২
বুদ্ধির খেলা ...	—	...	৬২৮
বেলুন আবিষ্কার (জানবার কথা) ...	নারায়ণ চক্রবর্তী	...	৮৪৭
বোকা হীরু (ছবিতে গল্প) ...	মৈত্রেয়ী মুখার্জী		২৬, ১০২, ১৮২
* বোবা ...	সঞ্চয়িতা কোলে	...	১৪৯
ভগোয়া পল্টন (শহীদ স্মৃতিকথা) ...	রঞ্জন মিত্র	...	২৫৮
* ভক্তের ভগবান ...	কল্যাণকুমার আচার্য	...	৩০১
ভয় দেখানোর শাস্তি (সত্য ঘটনা) ...	শ্রীদেবাশীষ চৌধুরী	...	৬৫
* ভাইয়ের বীরত্ব ...	শেখরকুমার চক্রবর্তী	...	৭১
ভাড়াটিয়ার জন্য (মজার ছবি) ...	—	...	৫৭৮
মজার ছবি ...	—		২১, ২৬৩, ৪১৬
মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি) ...			৭৫, ১৫৩, ২২৯, ৩০৮, ৩৮২, ৪৬০, ৫৩৬, ৬০৭, ৬৮৪, ৭৫৬, ৮৩১, ৯১০
মজার প্রশ্ন (মজার ছবি) ...	—	...	৩১৮, ৪৩৮
"৺মণিধর স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা" (ঘোষণা)		...	৩০০
মধুর বাক্য ...	শর্মিলা রায়	...	৯০২
মরণ হরণ নীলপদ্ম (রূপকথা) ...	শোভা চৌধুরী	...	৫৪২
"৺মলয়কুমার নাগ স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা" (ঘোষণা) ...	—	...	৯০৯

বিষয়	লেখক-লেখিকা		পৃষ্ঠা
মাছের চিন্তা (মজার ছবি)	—		২৫
মানুষ বেচার ব্যবসা (সত্যঘটনা)	জীবন ভৌমিক		৯০৫
"৺মিতালী মাইতি স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা" (ঘোষণা)			৮৩০
মুন্নার বাজীপ্রভু দেশপাণ্ডে (অমর বীর কাহিনী)	শ্রীমধুসূদন মজুমদার		৮৫১
* 'মৃত্যু থেকে অমৃতের দিকে'	মিত্রা চৌধুরী		৮২৬
মৃত্যুর সাঁথে পাঞ্জা (জীবন কথা)	অশোক পোদ্দার		৪৬৭
মেডিনা (বিদেশী গল্প)	ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত		১০৬
মেয়ের বিয়ে (কবিতা)	শ্রীঅসীমকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়		১৫৭
"৺মৌঝুরি স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা" (ঘোষণা)			৩৬৩
যুগ পালটেছে	—		৮৩৮
রংয়ের মজা (মজার ছবি)	—		১৪৮
রহস্যময় অভিযাত্রী	নারায়ণ দেবনাথ	(প্রতি সংখ্যায় প্রচ্ছদপট)	
রহস্যময় জাহাজ (গল্প)	চিত্তরঞ্জন রায়		৪৭৯
রাঙাকাকা আসছেন (গল্প)	সুনীল ভঞ্জ		৪৪
রাজনীতির চেয়ে সুখে থাকা ভাল (জানবার কথা)	—		২৭৬
রাজার শাস্তি	মুরারী মোহন মণ্ডল		৯০৮
রূপককথার আলেকজাণ্ডার (গল্প)	বিমলেন্দু দাশগুপ্ত		৮৮১
রূপকথার ফুলঝুরি (গল্প)	ডাঃ কামাইলাল ভট্টাচার্য	৮১, ৩৮৮, ৬৮৯	
"৺রেখা হাজরা স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা" (ঘোষণা)			৫৩২
রেডিওর আদি আবিষ্কারক সেই পাগলটা (জীবন কথা)	অদ্রীশ বর্ধন		৩৩৫
লম্বা দাড়ি চৌকিদার (কবিতা)	শ্রীপুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		২৩৩
"৺শান্তনুকুমার পাল স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা" (ঘোষণা)	—		১৩২
* শাপমোচন	অলক চক্রবর্তী		৫২৯
শিখগুরু হরগোবিন্দ (অমর বীর কাহিনী)	শ্রীমধুসূদন মজুমদার		৩২

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
শেষ মৌর্য শতংধনুঃ (অমর বীর কাহিনী)	শ্রীমধুসূদন মজুমদার ...	৩৩৯
শেষ রাতের অতিথি (বিদেশী গল্প) ...	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা ...	৪৮৩
* শ্যামলী গাই ...	ইভারানী মুখোপাধ্যায় ...	৪৫০
"৺শ্রীপদ দে স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা" (ঘোষণা) ...	— ...	৬০৯
সাগরের আহ্বান (গল্প) ...	চিত্তরঞ্জন রায় ...	২২
সাপ খেকো ব্যাঙ (সত্য ঘটনা) ...	বগলা যোগশর্মা ...	২২১
সাহসী (কবিতা) ...	শ্রীঅশোক সী ...	৩১১
"৺সিদ্ধার্থ বসু স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা" (ঘোষণা)	— ...	৬৬৫
"৺সুব্রত দাশগুপ্ত স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা" (ঘোষণা) ...	— ...	২২২
সুন্দা নরেশ রণশূর (অমর বীর কাহিনী) ...	শ্রীমধুসূদন মজুমদার ...	৬১৫
সেই ছোট্ট মেয়েটি (গল্প) ...	নির্মলেন্দু গৌতম ...	৮৯৭
সেক্সপীয়র ও কলকাতার ভূত (সত্য ঘটনা)	অম্বুজেন্দ্র ঘোষ ...	৮০৬
সোনার ঘণ্টা (ধারাবাহিক উপন্যাস) ...	অনিল ভৌমিক	২০৮, ২৭৭, ৩৪৯, ৪২১, ৪৯৮, ৫৮৩, ৬৬৮, ৭৩১, ৭৯৮, ৮৩৯
সোনা ও রূপা (ছবিতে গল্প) ...	দিলীপ দাস	২৫৪, ৩২৮, ৪০৬, ৪৯৬, ৫৬৪, ৬৪২, ৭১৪, ৭৯২, ৮৬০
হাঁদা-ভোঁদার কুকুর পোষা (ছবিতে গল্প) ৫১৪	হাঁদা-ভোঁদার ফাঁদপাতা (ছবিতে গল্প) ৬৬৬	
হাঁদা-ভোঁদার চাকরি করা (ঐ) ৪৪৮	হাঁদা-ভোঁদার ফুটবল ম্যাচ (ঐ) ৫৯২	
হাঁদা-ভোঁদার জ্ঞান দান (ঐ) ২০৬	হাঁদা-ভোঁদার বিপত্তি (ঐ) ৮২০	
হাঁদা-ভোঁদার দড়ির ফাঁস (ঐ) ৩৬৪	হাঁদা-ভোঁদার বুদ্ধি খাটানো (ঐ) ২৮৪, ৮৯০	
হাঁদা-ভোঁদার নতুন মজা (ঐ) ৭৪০	হাঁদা-ভোঁদার শিকার খেলা (ঐ) ৫২	
হাঁদা-ভোঁদার শূন্যে ডিগবাজী (ঐ) ...	— ...	১৪২
হারানো ছেলে (বিদেশী গল্প) ...	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা ...	৭৮৫

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ কর্তৃক অনুমোদিত নূতন সিলেবাস অনুসারে লিখিত—১৯৭৪

পশ্চিমবঙ্গের সমুদয় মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য

**** এ বছরের নূতন বই ****

—ষষ্ঠ শ্রেণী—

বাংলা সাহিত্য—

১। কনক মঞ্জরী (১ম ভাগ)
—ননীগোপাল আইচ ১·৮০

২। সোনালী পাঠ (১ম ভাগ)
—বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ ১·৮০

৩। মুক্তধারা—অধ্যাপক অম্বরীষ রাহা ১·৮০

৪। সাহিত্য দীপিকা (১ম ভাগ)
—শ্রীমধুসূদন দেব ১·৮০

বাংলা উপপাঠ্য—

দুন্দুভি—অধ্যাপক অম্বরীষ রাহা ২·০০

গণিত—১। গণিত-মুকুল (১ম ভাগ)
—অধ্যাপক দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায় ৪·০০

২। সরল জ্যামিতি (১ম ভাগ)
—অধ্যাপক দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায় ১·৮০

Eng. Gram.—
Steps to Good English, Book I
—N. C. Mukherjee ২·৮০

ইতিহাস—১। স্বদেশ কাহিনী (১ম ভাগ)
—অধ্যাপক সমরেশ ঘোষ ৪·০০

২। বাঙ্গালীর ইতিহাস
—অধ্যাপক শান্তিময় রায় ৪·০০

৩। সোনার বাংলা—শ্রীমধুসূদন দেব ৪·০০

Life Science—
জীবন বিজ্ঞান (১ম ভাগ)
—অধ্যাপিকা নীরা রাহা ৩·৫০

ভূগোল—১। ভূগোল পরিচয় (১ম ভাগ)
—অধ্যক্ষ চিত্তপ্রিয় রায় ২·৮০

২। সরল ভূগোল (১ম ভাগ)
—শ্রীমধুসূদন দেব ২·৮০

—নবম শ্রেণী—

বাংলা ব্যাকরণ—

১। নব প্রবেশিকা বাংলা ব্যাকরণ (IX-X)
—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য,
বিভাগীয়-প্রধান (বাংলা ভাষা ও সাহিত্য),
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৫·০০

২। নব প্রবেশিকা রচনা—(ঐ) ৫·০০

গণিত—

১। নব প্রবেশিকা গণিত
(অঙ্ক ও বীজগণিত)
—অধ্যাপক ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য,
এম. এস-সি. (গণিত) ৪·০০

২। নব প্রবেশিকা জ্যামিতি ও পরিমিতি
—অধ্যাপক ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য ৩·০০

Eng. Gram.—
Steps to Good English, Book IV
(IX-X)
—N. C. Mukherjee ৬·০০

Life Science—
জীবন বিজ্ঞান (৪র্থ ভাগ
—ডাঃ পি. নন্দী ৪·০০

Physical Science—
বিজ্ঞান আলোক
—অধ্যাপক দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায় ৪·০০

ইতিহাস—
ভারত কথা (নবম শ্রেণী)
—অধ্যাপক সমরেশ ঘোষ ৫·৫০

ভূগোল—ভূগোল প্রবেশিকা (নবম শ্রেণী)
—অধ্যক্ষ চিত্তপ্রিয় রায় ৩·৫০

● সোল ডিস্ট্রিবিউটর ●

পি. সি. মজুমদার অ্যাণ্ড ব্রাদার্স

২১।১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯

* পত্র লিখিলে নমুনা কপি পাঠানো হয়।

এবার পূজায়
দেব সাহিত্য কুটীরের
ছোটদের জন্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উপহার

এক খণ্ডে সম্পূর্ণ

বিশ্বের নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য এটি এক অসাধারণ বই। এই বই পড়ে বহু অজানাকে জানা যাবে, এর পাতায় পাতায় বিচিত্র ছবি কত না দেখা জিনিসকে চোখের সামনে তুলে ধরবে। ছবিতে ভরপুর প্রায় ৯০০০ পৃষ্ঠার বইটি না দেখলে না পড়লে বোঝাই যাবেনা কি বিচিত্র এই বই। কত সুন্দর, কত জ্ঞানের ভান্ডার এই বই।

২৫·০০ টাকা পাঠালে রেজেস্টারী করে পাঠান হয়

দেব সাহিত্য কুটীর
২১, ঝামাপুকুর লেন • কলিকাতা - ৯